॥ প্রথম অধ্যায় ॥
গণজীবন : ভূমিকা

'গণজীবন' বলতে সাধারণ অর্থে বুঝে থাকি জনসমষ্টি বা অখণ্ড একত্র জীবন। ইংরাজিতে Life of the people in general বলা যায়। কথাটি কাব্যিক ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধ এবং একটি বিশেষ অর্থেই শুধু অল্প—বিস্তর পরিচিত নয়, বস্তুত: বহ্বর্থক এবং ব্যাপক। ড: ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় :

" 'গণ' বা 'প্রোলেটারীয়' কথাটির প্রথম উৎপত্তি হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষকালে জার্মানীর সোশ্যালিস্টদের মধ্যে।" ১

আজকাল সভা, সমিতি, সংবাদপত্র এবং হ্যাণ্ডবিলের পাতা জুড়ে এই শব্দটির বহুল প্রয়োগ আমাদের দৃষ্ট আকর্ষণ করে। আসলে কথাটি আধুনিক শব্দ গোষ্ঠী-ভুক্ত মনে হলেও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মেই কিন্তু সর্বপ্রথম ধ্বনিত। সুতরাং একবাক্যে বলা যেতে পারে, এই 'গণ জীবন' আমাদের জনগণ-জীবনেরই একটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ।

কৃষক-শ্রমিক, কেরানি, কারিগর প্রভৃতি খেটেখাওয়ার দলের এই বৃহত্তর অংশের অবাধ প্রবেশ যে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, মার্ক্সবাদীরা তাকেই সার্বিক অর্থে 'গণ-সাহিত্য' আখ্যা দিয়ে থাকেন। এ ধারার সাহিত্যকে মার্ক্সবাদী সাহিত্য কিংবা সর্বহারার সাহিত্য নামে চিহ্নিত করা যায়।

প্রসঙ্গত : "কলকাতার তরুণ লেখক সম্মেলন" শীর্ষক নিবন্ধে ধনঞ্জয় দাশের মন্তব্য অনুসরণ করা যেতে পারে :

"আমাদের দেশের প্রগতি শীল সাহিত্যিক করা, বিশেষ করে তরুণ লেখকেরা, যাঁরা আমাদের দেশের সাহিত্যের সংকটের এই উৎসমুখ সম্পর্কে একমত, নীতিগত ভাবে সাহিত্যের বিকাশের জন্য তাকে জনজীবনমুখী হতে হবে বলে যাঁরা মনে করেন, এই সম্মেলনে তাঁরা অন্তত এই এক বিষয়ে সকলেই একমত হন যে, এই সংকট সমাধান করতে হলে আমাদের সকলকে শারীরিক ভাবেই শ্রমজীবী জনগণের 'জীবনে জীবন যোগ' করতে হবে; জনসাধারণের সঙ্গে থেকে তাঁদের জীবনের শরিক হয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে হবে, তবেই সাহিত্যিকের পক্ষে জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হওয়া সম্ভব, তাঁদের আত্মীয় হওয়া সম্ভব।" ২

সেই হেতু মনে করা যেতে পারে, সাধারণ মানুষের ব্যথা-বেদনার সমন্বয়ে যে জীবন লক্ষ মুখে প্রবাদের মতো আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছে, সেখানেই হয় তো

---

১. মার্ক্সবাদী সাহিত্য বিতর্ক— ৩ | ধনঞ্জয় দাশ | পৃ: ২৭ | ৩য় খণ্ড | ১ম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭৮

২. ঐ | ঐ | পৃ: ২৬১ | ২য় খণ্ড | ১ম প্রকাশ মার্চ ১৯৭৬

সমগ্র জীবনের সন্ধান মিলবে। তবু সংশয় থেকে যায় ~~হয়তো~~ এই কারণে যে তাহলে এদের সত্যিকার পরিচয় কি? এরা কোন পোশাকে সমাজ-চক্ষে চিহ্নিত? নিঃসন্দেহে, এটি একটি জটিল প্রশ্ন। তবে কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রস্তুত না থাকলেও বলা যেতে পারে, কালপরম্পরায়, সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মনৈতিক নানাবিধ পীড়ন, বঞ্চনা, উপহাস এবং বৈষম্যের ~~সদৃশ~~ অন্তর্জ্বালা যাদের জীবনের অগ্রগতিকে পদে পদে ব্যাহত করেছে সেই বৃহত্তর জনজীবনেরই আর এক নাম 'গণজীবন। একথা সর্বজন বিদিত যে সভ্যতার সূচনাপর্ব থেকে মানুষ একমাত্র বুদ্ধি, সাহস, পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ শক্তির দ্বারা আজ শুধু সমুদ্র, পর্বত, মরুভূমি, গ্রহ, উপগ্রহের রহস্য ভেদ করতে মাত্র সক্ষম হয়েছে তাই নয়, বিশেষ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় নগর পত্তন করে বিশিষ্টতার গুণে অভিনবত্বের স্বাক্ষরও সুদৃঢ় করেছে। মানুষের এই কর্মদক্ষতা সচেতনতার নবারুণ-স্পর্শেই উত্তরোত্তর বিকশিত এবং সম্প্রসারিত। ভারতবর্ষে সত্তর শতাংশের সংখ্যা-গরিষ্ঠ জীবন, কার্যত যা গণজীবন, কলকারখানায়, মাঠে, বাগিচায়, নিরক্ষরতার বলি হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তদুপরি বৈদিক যুগের সমদৃষ্টির মতো সুস্থ মূল্য বোধ কালক্রমে অস্বীকৃত হয়ে জাতিভেদ-প্রথার তীব্র আবর্তে সমাজ জীবনকে বয়ে নিয়ে চলেছিল। সেখানে বৈষম্যের জাগরণে উচ্চ নিচ শ্রেনী-বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি। সেই অপাঙক্তেয়দের মুক্তির জন্য অনেকে ভেবেছেন বলেই প্রতিক্রিয়াও আংশিক ফল দান করেছে বৈকি।

এই বিপুল মানব সমাজের কল্যাণের জন্য যাঁরা নির্দ্দিষ্ট পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন, এখন সেই পথ এবং উপায়গুলো কি তা দেখা যেতে পারে। প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের মতো শোষণ, পীড়ন এবং বঞ্চনার অবসান ঘটাতে পারে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজ, গণতন্ত্র, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অধিকার প্রাপ্তির সুযোগ করে দেয়। পুঁজিবাদের বিনাশ ঘটে তারই আঘাতে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের পাশে, সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতি বরং বেশী উৎসাহ ব্যঞ্জক। মার্ক্সীয় মানবতাবাদ জনগণের হিতসাধনে প্রবৃত্ত।

মানুষকে নিয়ে সমাজের কারবার যখন, তখন মানুষের মনুষ্যত্বকে সর্বোপায়ে দাসত্ব মুক্তির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার মতো পরিবেশ তৈরী করতে হবে। যা ফ্যাসীবাদ পরাধীনতার অন্ধকূপে গণজীবনের শ্বাসরুদ্ধ করেছিল। মার্ক্সীয় ভাবমতের আলোকে রবীন্দ্রনাথকে সমাজের অসমতার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখা গেছে। তাঁর সমবেদনার উজ্জ্বল নিদর্শন নিচের পংক্তি ক'টি:

"আহা, এমন প্রজা আমি দেখিনি—এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ

এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে। আমার কাছে এই সমস্ত দুঃখ পীড়িত অটল বিশ্বাস-পরায়ণ অনুরক্ত ভক্ত প্রজাদের মুখে এমন একটি কোমল মাধুর্য আছে, এদের দিকে চেয়ে এবং এদের কথা শুনে সত্যি সত্যি বাৎসল্যে আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। বাস্তবিক এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই-সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষা ভুষোদের আপনার লোক মনে করতে বড়ো এক সুখ আছে।"১

কার্ল মার্কস, এবং এঙ্গেলস 'Communist Manifesto-র (ফেব্রুয়ারী/১৮৪৮) প্রারম্ভে দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেন :

"The history of all hitherto existing society is the history of class struggles."

সুতরাং মার্কসীয় সমাজবোধ যে পরিধির ভিতর আচরিত সেটিই জীবন্ত সমাজ। আর এই পীঠভূমিতেই ব্যষ্টি, সমষ্টিতে মিশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের শ্রমজীবী মানুষের জীবন সত্যকে সাহিত্যে প্রবেশের যথার্থ সুযোগ করে দেয়। সাহিত্য- বিষয়ক আলোচনায় অগ্রসর হবার আগে মার্ক্সীয় জীবন- সত্য সম্পর্কে চুম্বক ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা আছে মনে করি। মানুষ সম্পর্কে মার্ক্সের বিশ্বাস :

"সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের যোগফল। মার্ক্স, এঙ্গেলসের মতো, লেনিনও দেখালেন বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতন্ত্র, ও কমিউনিজম একটা অখণ্ড ও সুসমঞ্জস পথ। এর ভিতর দিয়েই অর্থনৈতিক সবলতা অর্জনের জন্য রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার স্পৃহা জাগে। ফলে বুর্জোয়া শক্তির বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেনীর গণবিপ্লব সাম্যবাদী আদর্শকে সাধনযোগ্য মানবিক আদর্শে পরিণত করে। সবারই নিশ্চয়ই জানা আছে যে এই কারণেই, মানুষের মুক্তির বাণী অনেকেই উদ্ধার করেছেন। এই মুক্তির কথা, সুইস্ অর্থনীতিবিদ সিস্‌মন্দি (১৭৭৩-১৮৪২), ফরাসীদেশের প্রুধোঁ (১৮০৯-১৮৬৫), লুই ব্লাঁ-র (১৮১১-১৮৮২) কণ্ঠেও উচ্চারিত। এঁরা পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা বলে বুর্জোয়া এবং জনগণের মিত্র বন্ধু।

ফরাসী রাজনৈতিক বিপ্লবী অগুস্ত ব্লাঙ্কি (১৮০৫-১৮৮১) ধনতন্ত্রী ব্যবস্থার অবসান ঘটাবার জন্য বলেছিলেন তাঁরা কমিউনিষ্ট। নৈরাজ্যবাদে বিশ্বাসী 'মিখাইল আলেক্‌সান্দ্রাভিচবাকুনিন'-ও (১৮১৪-১৮৭৬) মানুষের কথা ভেবেছেন। উক্ত মতাবলম্বীদের জীবনাদর্শ মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের চিন্তাধারার সঙ্গে পার্থক্য সৃষ্টি করায়

১০ রবীন্দ্র রচনাবলী | ছিন্নপত্রাবলী | পত্র সংখ্যা ১১১ | পৃ: ১২৪ | একাদশ খণ্ড : প্রবন্ধ ২২শে বৈশাখ ১৩৬৮।

তাঁরা বিরোধিতা এবং সংগ্রাম করতেও দ্বিধা বোধ করেননি। তাই 'দুনিয়ার মজুর এক হও'—এই রণহুংকারের গর্ভেই প্রলেতারিয়েতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রথম ঘোষিত। অধিকাংশ চিন্তানায়কদের ধারণা, সুস্থজীবন যাপনের একমাত্র পথ, পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে। তাহলে দেখা যায় সমাজতান্ত্রিক মানবতা বলতে অখণ্ড মানবজীবনের কথাই স্মরণে আসে। মার্ক্সবাদের প্রথম ও শেষ শিক্ষার একটি মাত্রই মন্ত্র "বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র কে" ("আগেকার তৈরী রাষ্ট্র কে) নিশ্চিহ্ন করার পর সেইশূন্য স্থানে বসাতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র এবং এই নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বেই মাত্র পরিচালিত হবে।" ১

গণজীবনমুখী সাহিত্যে চোখ রাখলে এই পরম সত্যকে দর্শন করা যাবে। সাহিত্যের কারবার আজকাল এই সমভাবনার সমন্বয়ে গঠিত এবং গঠনকল্পে সাহিত্যিকদের একটা প্রয়াস দুনিবার প্রেরণায় প্লাবিত। প্রসঙ্গক্রমে বীরেন পালের সুচিন্তিত কথা মনে জাগে:

"১৯৪৬ সালের গণসংগ্রাম জীবনের এমনি স্পন্দন সৃষ্টি করেছে অসংখ্য অসহায় ব্যক্তির প্রাণে প্রাণে, কিন্তু বনফুল 'অগ্নি'তে আগষ্ট সংগ্রামের প্রচ্ছদপটে এমন জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করতে পারেননি। অংশুমান মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসে ভাবছে সে কি করতে পারে। অংশুমান প্রেরণা খুঁজছে স্বপ্নে আর অক্ষয় ও রসুল প্রেরণা পেয়েছে বাস্তবে, অংশুমান একা, অক্ষয় ও রসুল অনেকের মধ্যে একজন। অংশুমান জীবন থাকতে মৃত, রসুল মৃত্যুর পরেও জীবনের আলো দেখতে পাচ্ছে। এই পার্থক্য হল দৈন্যগ্রস্ত মৃত্যুমুখী প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের সঙ্গে নবজীবনের চারণ-প্রগতি-সাহিত্যের পার্থক্য।

... ...সাহিত্যে আগে জনগণের অস্তিত্ব দেখা যেতনা। বিগত মহাযুদ্ধের পর তারা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে, সাহিত্যিকদের দৃষ্টি পড়েছে তাদের দিকে।

... ...সজনীকান্তের দল তাদের দিকে তাকাচ্ছেন উদীয়মান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক প্রগতিকে বাধা দেবার উপকরণ সংগ্রহের জন্য, তারাশংকরবাবু গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাদের শুধু অতীতটা দেখছেন, দেখছেন না তাদের সুস্পষ্ট ভবিষ্যৎ, মানিকবাবু ও ননী ভৌমিক প্রমুখ লেখকেরা তাদের ভবিষ্যৎ দেখতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু মানিকবাবুর দৃষ্টি এখনো সীমাবদ্ধ, এখনো সাহস করে সত্য উদ্ঘাটনের পথে বেশীদূর পা বাড়াতে পারেননি। 'পরিস্থিতি' থেকে আরম্ভ করে

১. পার্থ ঘোষ। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসের পাতা থেকে। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ। সেপ্টেম্বর ১৯৭০।

'চিহ্ন' পর্যন্ত তিনি নিত্য নতুন ভঙ্গীতে একটি পরম সত্য আবিষ্কার করে চলেছেন। সে সত্য হল ধনিক সমাজের দৈন্য এবং গণসমাজের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ।

……দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যেমন গণসংগ্রামের জোয়ার দেখা দিল, সাহিত্য জগতেও তেমনি একটি জোয়ার দেখা দিল।

……তাই প্রত্যেক সাহিত্যিক এই যুগে গণমানুষের কাছে নেমে এসেছেন, তাকে অস্বীকার করা অসম্ভব।" ১

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে প্রাকস্বাধীন বাঙলাদেশের গ্রামীণ মানুষের নির্যাতনের যে চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়, সেখানে চিরকালের প্রজাদের ভূমিহীন জীবনের দুর্দশার কথাই বিধৃত।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' হেমচন্দ্রের 'ভারতসংগীত' ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' সেকালের মানবতাধর্মী বৈপ্লবিক প্রেরণার উৎস। রবীন্দ্রনাথ জমিদার হয়েও মানবতাবাদীদের শরিক হবার অব্যক্ত কামনা মনে পোষণ করতেন বলেই হয়তো নিঃসঙ্কোচে এতবড় মনুষ্যত্ববোধের কথা আমাদের শুনিয়েছিলেন :

"আমার জন্মগত পেশা জমিদারী। কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন যোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে 'পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই।" ২

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের (১৮৮৫, ১৯২৮, ১৯৩৮) রূপান্তর যে কারণেই ঘটুক না কেন, চাষীর উপকার কিন্তু আদৌ হয় নি। জমিদার সকল সুবিধাই আত্মসাৎ করে। পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির কথা (১লা বৈশাখ ১৩৬২, এপ্রিল ১৯৫৫) প্রথম ঘোষিত হয়। কিন্তু আজকের যে গ্রাম্য জীবন, সেখানে কিছু মঙ্গল যে হয়নি তা সম্পূর্ণ সত্য না হলেও যেন মনে হয় অতীতের সেই হিন্দু, পাঠান, মুঘল, মারাঠা, শিখ, ইংরেজের যুগই

১. মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক | ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত | ১ম খণ্ড | পৃঃ ১৩-২১

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | রাশিয়ার কথা | আষাঢ় ১৩৩৩ | ১৯৬৬ | কালান্তর

চক্রাকারে মানুষের জীবনে বারংবার উপস্থিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহেরু সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণযোগ্য :

"ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোর বদলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রবর্তন। দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রশক্তির মধ্য দিয়ে যদি দেশের শুভবুদ্ধি ও কর্মের উৎসাহ আত্মপ্রকাশের পথ পায়, তবেই দেশের দুঃখ দূর হবে।

.....সোভিয়েত রাশিয়ার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ।"১

"ফ্যাশিজম্ ও কম্যুনিজম্-এর মধ্যে একটাকে যদি বাছাই করতে হয় তো তিনি কম্যুনিজম্-এরই পক্ষে।"২

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা'-র যবনিকা যেখানে টানা হয়েছে, সেখানেই বৃহত্তর সংগ্রামের বীজ উপ্ত হবার পরিবেশ পেয়ে গণজীবনকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবার নিশানা মোতায়েন করেছে।

আজ প্রগতিবাদীদের সাম্যমৈত্রী গড়ার চেষ্টা, সাধারণের জীবনকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবে উদ্যোগী। সুখের কথা, এই উদ্যোগ যুগোপযোগী। অপরদিকে সমাজ উন্নয়নের আংশিক দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবে লেখকদেরও। কারণ রাজনীতির সঙ্গে জীবন ও সাহিত্যের নাড়ির টান অচ্ছেদ্য। এর ফলে দীর্ঘ কৃচ্ছ্র-সাধনার মধ্য দিয়ে নাটক, গল্প উপন্যাস কবিতা এক নতুন সাজঘরে সজ্জিত হয়ে উঠতে উদ্যত, যার ভিতর অনিবার্য্যভাবে সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সমষ্টির স্বার্থ সক্রিয়।

দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নবনাট্য আন্দোলনের সংকট' প্রবন্ধ থেকে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য এ স্থলে অপেক্ষিত :

"—সাম্রাজ্যবাদীর এবং তাদের দোসরদের কবল থেকে অব্যাহতি না পেলে এ দেশের জনসাধারণের যথার্থ মুক্তি নেই। এই অর্থনৈতিক মুক্তি-সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠবে নতুন গণ-সংস্কৃতি। সুতরাং প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীদের পক্ষে আজ পথ বেছে নেওয়া এবং লক্ষ্য স্থির করা কিছু কঠিন নয়।"৩

একথা সত্য, ইতিহাস পরিবর্তিত হয়েছে, গণঅভ্যুত্থানের চাপে। অভ্যুত্থান অগ্ন্যুৎপাতের মতোই একদিনে প্রকাশ পায়নি। দীর্ঘ দিনের ভাবাত্মক এবং বাস্তবধর্মী আন্দোলনে এই রূপান্তর ত্বরান্বিত। ইতিহাসের সেই অক্ষর পাওয়া

১. বিশ্ববিদ্যালয় সিরিজ | বিশ্বভারতী | অমিয় মালিক চৈত্র ১৩৫০ | প্রকাশ ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১/১৯৪৪।

২. হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় | তরী হতে তীর | পৃঃ ৩৮৭ |

৩. মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক | ২য় খণ্ড | পৃঃ ২০১

যায় নিম্নবর্ণিত দৃষ্টান্তগুলির ভিতর :

* ॥ ক ॥ খ্রীষ্টপূর্ব ৭৩-তে প্রাচীন রোমের দাসবিদ্রোহ।

** ॥ খ ॥ ইংরেজী ১৩৮১তে ইংলণ্ডের ওয়াটটাইলার জাগরণ (কৃষকবিদ্রোহ)

*** ॥ গ ॥ ইংরেজী ১৫২৪-২৫-এ জার্মানিতে কৃষক-বিদ্রোহ।

**** ॥ ঘ ॥ ইংরেজী ১৭৬৯-৯৯-এ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রাম।

***** ॥ ঙ ॥ ইংরেজী ১৭৭৩-৭৫-এ রাশিয়ার পুগাচভের সংগ্রাম।

---

* ক ॥ রোমের অভিজাতরা নানা উপায়ে সাম্রাজ্যের মধ্যে বড় বড় জমিদারী গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই সব জমিদারীর নাম 'লুটিফান্তিয়া'। সময়ে সময়ে এইরূপ এক-একটা জমিদারী যেন ছোট খাট একটা প্রদেশ। এই জমিদারীতেও চাষের কাজ করে দাসগণ, কর্মচারীরা লাঠি ও চাবুক লইয়া দাস চাষীদের তদারক করে। —সংস্কৃতির রূপান্তর | গোপাল হালদার | পৃঃ৭৪-৭৫ |

** খ ॥ দ্বিতীয় রিচার্ডের শাসনকালে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। জনৈক কর্মচারী ওয়াটটাইলার (wattyler) নামক এক ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার স্ত্রী কন্যাকে অত্যন্ত অপমানিত করে। ফলে ওয়াটটাইলারের নেতৃত্বে কেন্ট প্রদেশের লক্ষাধিক কৃষক ও শ্রমিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করে। —রাজনীতির মূলকথা। প্রগতি প্রকাশন | মস্কো | বাংলা অনুবাদ। ১৯৭৫ | পৃঃ ৩৮ |

*** গ ॥ সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার দীর্ঘ সংগ্রামের পরিণতি হয় তিনটি চূড়ান্ত মহাযুদ্ধে। প্রথমটিকে বলা হয় জার্মানির প্রটেস্টান্ট রিফর্মেশন। চার্চের বিরুদ্ধে লুথার যে রণধ্বনি তোলেন তাতে সাড়া দেয় দুটি রাজনৈতিক চরিত্রের অভ্যুত্থান। প্রথমে 'ফ্রানৎস ফন জিকিঙ্গেনের নেতৃত্বে নিম্ন অভিজাতদের অভ্যুত্থান (ইং ১৫২৩) পরে ১৫২৫ সালে মহান কৃষক যুদ্ধ। —কালমার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। ২য় খণ্ড | প্রথম অংশ | পৃঃ ৯৯—১৩৩ |

**** ঘ ॥ ১৭৬০ সালের ২০শে অক্টোবর মুর্শিদাবাদের মসনদে মীরকাসিম বসে প্রজাদের উপর নির্যাতন চালাতে থাকেন। ১৭৬৯-এর মধ্যেই বাংলার বুকে আর্থিক দুর্দশার কাল মেঘ চরম আকার ধারন করে। ফলে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়

৮ Contd = Footnote

এই বিপত্তির কথা অগ্রাহ্য করে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার পর থেকেই কৃষক বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে এবং ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে বংশানুক্রমিক জমিদার সৃষ্টির (কোম্পানীর) চক্রান্ত কৃষক বিদ্রোহকে ত্বরান্বিত করে। উপজাতিরা নির্দ্বিধায় এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে। এই বিদ্রোহের মধ্যে ধলভূম বিদ্রোহ (১৭৬৯-৭৪), চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৯৯)। প্রবন্ধ লেখক শশিভূষণ চৌধুরী। পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী আন্দোলন। পৃঃ ১। সম্পাদনা ডঃ অমল কুমার দাশ ও ডঃ শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়। বিশেষ সংখ্যা ২১। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭।

৬) ইয়েমেলিয়ান পুগাচভ, কৃষক ও কসাকদের বৃহত্তম সামন্ত বিরোধী বিদ্রোহের নায়ক। দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আমলে সর্বশেষ বৃহৎ একটা কৃষক অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছিল শুধু এই কারণে যে ইয়েমেলিয়ান পুগাচভ দাবি করে যে সে হল ক্যাথারিনের স্বামী তৃতীয় পীটার। পত্নী তাঁকে নাকি হত্যা করেন নি। সিংহাসন চ্যুত করে কারারুদ্ধ করেছিলেন এবং সেখান থেকে সে এখন পালিয়ে এসেছে। পৃঃ ৫৪

৮) ইংরেজী ১৮৫৭-তে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ ॥

বিদ্রোহীদের সংগ্রাম স্বাধীনতা বাঁচার তাগিদের সৃষ্টি। মিঃ তকাচভ বলেন —"প্রতিটি সত্যিকার বিপ্লবই সামাজিক বিপ্লব, কারণ সে নতুন একটি শ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে আর সেই শ্রেণীকে তার নিজের ধাঁচে সমাজকে পুনর্গঠিত করার সুযোগ দেয়।" ১ → ৯ পৃঃ

ইউরোপের নব জাগরণও আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। বহুদিনের ক্ষুদ্রতা, কুসংস্কার মানুষকে বাধা নিষেধের শৃংখলে আবদ্ধ রেখেছিল। দীর্ঘদিনের কর্মসাধনার মধ্যে দিয়ে এক নতুন জীবনবেদ এবং শুভবার্ত্তা পরিশেষে উদগীত হয়েছিল। তারই ফলে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবোধের (Nationalism) উন্মেষ। গ্রীকমনীষী এবং দার্শনিক প্লেটো, এ্যারিস্টটল, হোমার, দান্তে প্রভৃতির রচনা সম্ভার কুসংস্কারের অচলায়তন ভেঙে দিয়ে অসাম্যের মধ্যে সাম্যের আদর্শ তুলে ধরে। মানবপ্রেমিক ইতালীয় পণ্ডিত পেত্রার্ক, বোক্কাচো, ম্যাকিয়াভেলীর অবদান বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। of law' লিখে, যুক্তি ও প্রগতিবাদী ভলটেয়ারের তীব্র শ্লেষাত্মক ক্ষুরধার রচনা এবং 'Social Contract' লিখে রুশো অভাবনীয় জাগরণ সৃষ্টি করেন মানুষের মনে। দুঃখ করে রুশো একদিন এই মূল্যবান কথাটি বলেছিলেন: 'Man is born free but everywhere man is in chains.'

প্রসঙ্গত: বিবেকানন্দের উক্তি এস্থানে উল্লেখযোগ্য: "সমাজের নেতৃত্ব

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে ফরাসী বিপ্লবী সাহিত্যিকদের মধ্যে মন্টেস্কু, 'Sprit

বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক বা বাহুবলের দ্বারা বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। ···· স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনও মতে চলে না, আত্ম-রক্ষা পর্যন্তওঅসম্ভব। এই স্বার্থরক্ষার্থ সহকারীত্ব সর্বদেশে সর্বজাতিতে বিদ্যমান।" [৯] অন্তর্দাহ থেকে বিদ্রোহের প্রকাশ। সেই অন্তর্দাহ ব্যক্তি থেকে গোষ্ঠীতে বদ্ধ হলেই তাকে আমরা গণবিদ্রোহ বলে থাকি। ভারতে একদা ব্রিটিশ কোম্পানীর অর্থ-লিপ্সার শিকার হয়েছিল আদিবাসী এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ। এদের সম্পর্কে কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত:

"নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে গণ-বিদ্রোহ। কিন্তু এসব বিদ্রোহ ছিল আঞ্চলিক ও সীমাবদ্ধ। এবং মূলত ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ এসব বিদ্রোহের আদর্শ ছিলনা। ইংরেজের শোষণ ও অত্যাচার বিশেষ ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গেলে তারই বিরুদ্ধে এইসব গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ে। এসব বিদ্রোহের যে প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে, ঐতিহ্য হিসেবে তা প্রগতিবাদীর কাছে খুবই মূল্যবান। কিন্তু সাহিত্যে এসব বিক্ষিপ্ত। ············ সিপাহী বিদ্রোহের পর এদেশে প্রথম বিদেশীর উপনি-বেশিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র স্থাপিত হয়।" [২]

মানিকবাবুর যুক্তির পাশে নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামত শোনা যাক:

---

* চ) ভারতে বিদ্রোহী সিপাহীরা যে অত্যাচার করেছে তা বাস্তবিকই ভয়ংকর, বীভৎস, অবর্ণনীয়—যা কেবল অভ্যুত্থানী যুদ্ধে, জাতিযুদ্ধে, বর্ণযুদ্ধে ও সর্বোপরি ধর্মযুদ্ধেই দেখার জন্য তৈরী থাকতে হয়; এক কথায়, তেমনি অত্যাচার, শালীন ইংলণ্ড যার তারিফ করেছে, যখন তা ভেঁদীয়রা চালিয়েছে 'ব্লু'-দের ওপর, স্পেনীয় গেরিলারা চালিয়েছে নাস্তিক ফরাসীদের ওপর, সার্বীয়রা চালিয়েছে তাদের জার্মান ও হাঙ্গেরীয় প্রতিবেশীদের ওপর, ক্রোশীয়রা চালিয়েছে ভিয়েনার বিদ্রোহীদের ওপর, কাভেনিয়াক-এর গার্ড মোবিল বা বোনাপার্টির ডিসেম্ব্রিস্টরা চালিয়েছে ফ্রান্সের প্রলেতারীয় ছেলেমেয়েদের ওপর। ~~(১০২)~~। সিপাহীদের আচরণ যতই নিন্দনীয় হোক তা শুধু ইংলণ্ডের প্রাচ্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর্বেই নয়, গত দশবছরের দীর্ঘ-স্থাপিত শাসনেও ইংলণ্ড নিজে যা আচরণ করেছে তারই একটি পুঞ্জীভূত প্রতিফলন।
— কার্ল মার্ক্স ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে। পৃঃ ১৫৬।

১. কার্ল মার্ক্স ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। ২য় খণ্ড। প্রকাশ অংশ। পৃঃ ৪৮।

---

৯. বর্তমান ভারত ১৮৯৯। বিবেকানন্দের রচনাবলী।

২. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক-২। ধনঞ্জয় দাশ। পৃঃ ২৮। ১ম প্রকাশ মার্চ ১৯৭

"সত্যি কথা বলতে কি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশ ছলে বলে কৌশলে দখল করলেও একেবারে নিরাপদে নিশ্চিন্তমনে রাজশাসন করার সৌভাগ্য তাদের কোন দিনই হয়নি। সমাজের উপরতলা থেকে সহযোগী আর তাঁবেদার তারা বরাবরই পেয়েছিল; কিন্তু সমাজের নিচের তলার নির্যাতিত শোষিত মানুষেরা কোনদিনই ব্রিটিশের গোলামিকে প্রসন্ন মনে নেয়নি নয়, এই ব্রিটিশ শাসন আর সেই শাসনের পদাশ্রিত দেশী শোষকদের উচ্ছেদ করার জন্য লড়াই চালিয়েছিল নির্ভীকভাবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই এই লড়াই সশস্ত্র গণবিদ্রোহের আকারে দানা বেঁধে উঠেছিল। ১৭৭২ সালে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ক্ষুধিত, নিঃস্ব কৃষকদের অভ্যুত্থান ঘটে সামন্তনবাব আর ব্রিটিশ লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহ-ই সন্ন্যাসী—বিদ্রোহ নামে খ্যাতিলাভ করেছিল। ... ...উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে এই সংগ্রামে আবার নতুন করে এল প্রচণ্ড জোয়ার। ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল অভ্যুত্থান ঘটলো তা ছিল বাঙালী মহাজনদের নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে, মহাজন আর জমিদারদের আশ্রয় দাতা ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে এই মরণ পণ শ্রেণী-সংগ্রাম।" ১

আসলে এই মেহনতী মানুষদের বিদ্রোহগুলো স্বাধীনতার স্পৃহাকে দমননীতির ঊর্দ্ধে তুলে ভবিষ্যতের বিপ্লবাস্ত্রে শান্ দিয়ে রাখার মতো। আর এই নব অনুভূতি শোষকের নির্মমতায় সৃষ্টি। তখন আত্মরক্ষার প্রশ্নে পীড়িত গণজীবন দুর্বার, মরীয়া।

এতকালের ভক্তি ও ধর্মাবেগের অনিবার্য সোপান বেয়ে যে গণজীবন বিংশ শতাব্দীর বাঙলা কাব্যে প্রতিষ্ঠিত হলো তার ঐতিহাসিক মূল্যায়ণের সময় সীমা এ নিবন্ধে পরাধীন ভারতবর্ষের ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে সীমাবদ্ধ।

স্বভাবতঃই লোকজীবনের কথাও গণজীবনের ব্যাখ্যায় এসে পড়ে। এ দুটি শব্দ অর্থগত দিক থেকে পরস্পর দুরস্থ নয়। প্রথমটি প্রাচীন কালের, সাধারণ নিরক্ষর জনসমাজের অর্ধবিস্মৃত জীবনের ইঙ্গিতবাহী, দ্বিতীয়টি আধুনিক কালের জনসমাজের প্রত্যক্ষ জীবনের। লোকজীবনই সচেতন সামাজিক অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়ে গণজীবনে রূপ নেয়। লোকজীবন প্রাচীন এবং গণজীবন নবীন।

লোকজীবনের পরিচয় প্রাচীন পর্যায়ের বিষয়বস্তু আর গণজীবন সেখানে নতুন নামে, নতুন ধ্যান-ধারণার স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় পৃথকভাবে অত্যুজ্জ্বল। সাধারণ অর্থে লোকজীবন এবং গণজীবন বলতে বুঝে থাকি জনসাধারণকে। এখন এই জনসাধারণকে লোকজীবন এবং গণজীবন ভিত্তিক সাহিত্যের দরবারে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের নিরীখে পাশাপাশি আলোচনা করা যেতে পারে।—

---

১. মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক-২ | ধনঞ্জয় দাশ | পৃঃ ২৯।১ম প্রকাশ মার্চ ১৯৭৬।২য় খণ্ড

লোকসাহিত্য	গণসাহিত্য
(১) লোকজীবন থেকেই এর সৃষ্টি।	(১) গণজীবন থেকেই এর সৃষ্টি।
(২) বাস্তব এবং অবাস্তবতারে মধ্যে লোকচরিত্রের বিকাশ ঘটে।	(২) সমাজ-বাস্তবতার মধ্যে গণচরিত্র স্পষ্টতা পায়।
(৩) প্রাচীন বিশ্বাস, সংস্কার নিয়েই অবিচল।	(৩) ব্রহ্মজ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান নয় মানুষ সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত সত্য।
(৪) নতুন সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় নেই।	(৪) সমাজ-বিজ্ঞান সর্বত্র তার সুদূর প্রসারী আলো ফেলে জড়তার অবসান ঘটাচ্ছে।
(৫) লোক সংস্কৃতির বক্ষেই তার জন্ম এবং পরিণতি।	(৫) সচেতনভাবে পরিবর্তিত, পরিমার্জিত এবং বিচিত্র সমাজ ভাবনার পথে এ সাহিত্যের বিকাশ।
(৬) প্রাথমিক রূপ অলিখিত। মৌখিক রূপ অবশ্য কালক্রমে লুপ্ত প্রায়।	(৬) মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার মৌখিকরূপকে লেখ্য-রূপে প্রকাশ করে, নবজাগৃতির গুণে।
(৭) একক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়।	(৭) গণমানসের প্রেরণা পটে একক ব্যক্তির সৃষ্টি।
(৮) গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণে প্রকাশ।	(৮) গদ্যে, পদ্যে প্রকাশ হলেও ছন্দোবন্ধন পুরাতন ধারাকে অতিক্রম করেছে।
(৯) 'খেটে-খাওয়া' মানুষের জীবনের সঙ্গে প্রকৃতি এবং ধর্মকেও অবিকৃত-রূপে দেখা যায় এই সাহিত্যে।	(৯) চাষী, মজুর, শ্রমিক এবং অসহায়দের মনোবেদনার অমোঘ প্রকাশ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।
(১০) মুখে মুখে আবৃত্তি হওয়ার ফলে উচ্চারণগত তারতম্যের জন্য শব্দের আদল বদলে যেত।	(১০) মুদ্রাক্ষর অনিত প্রকাশরীতির গুণে রচনার রূপ অপরিবর্তিত।
(১১) স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি।	(১১) সচেতন সৃষ্টি।
(১২) পুরুষানুক্রমে প্রচারিত হওয়ার ফলে আসল চেহারার পরিবর্তন ঘটতো।	(১২) মানবজীবনের অগ্রগমণের ভিতর মুদ্রা-ক্ষরে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে পরিবর্তণের আশংকা নেই।
(১৩) গীতিকা, রূপকথা বা উপকথা ডাক ও খনার বচন, লালদহের গম্ভীরা, ছড়া, পাঁচালী, যাত্রা	(১৩) রাজনৈতিক, সামাজিক ঘটনাই যেখানে সাহিত্যের আঙ্গিক জুড়ে একটা বিশেষ কালকে নিয়ে অবস্থান করে. সেখানে

লোকসাহিত্য	গণসাহিত্য
কথকতা, ব্রতকথা একক রচয়িতারই শ্রম-ফসল। সামাজিক অনুষ্ঠান এবং উৎসব কালেই দীর্ঘ এই ধারার রচনা হলেও দশজনের কণ্ঠ বেয়ে সমগ্র জনগণের সম্পত্তি হয়ে ওঠে। স্রষ্টার নাম শেষোবধি মুছে যায়।	অতীতের নিয়ম লঙ্ঘন আশাতীত কিছু নয়। ফলে তরুণদের কলমে প্রগতিসাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে।
(১৪) রচনা সম্ভারকে, হেঁয়ালী বা ছড়া ধাঁধা প্রবাদ, প্রবচন, লোক গাথা লোককথা পর্যায়ে ভাগ করা যায়।	(১৪) গণ সাহিত্য যখন সর্বজনের মর্মবেদনার মুকুর তখন লোকসাহিত্যের মতো পর্ব বিভাগের প্রয়াস কাম্য নয়। তবে প্রত্যক্ষ বাস্তব এ সাহিত্যের ভাণ্ডারে মুখ্যসম্পদরূপে চিত্রিত। গৃহীত।
(১৫) প্রত্যক্ষ মানবিক আবেদনের ইঙ্গিত থাকায় এখানে যে জীবনকে দেখা যায়, তা কখনো কাঁদে, কখনো হাসে আবার কখনো কল্পনা বিলাসী হয়ে উঠতে আনন্দ পায়।	(১৫) যুদ্ধোত্তর কালীন জীবন যাত্রার প্রণালী পরিবর্তিত। ফলে সাহিত্যে অগ্রসর তার মধ্যে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের চেতনা বৃদ্ধির ইঙ্গিত পরিস্ফুট।
(১৬) অক্ষর-জ্ঞানহীন জনসমাজ প্রকৃতির বিচিত্রতার ভিতর সৌন্দর্য আস্বাদন করতে ভালবাসে। মাতৃরূপী পল্লী-বুকের সংগৃহীত সম্পদই লোকজীবনের ভাষায় সাহিত্য হয়ে ওঠে।	(১৬) ইংরেজী কবিতার মতো তাই বাঙলা সাহিত্যও সমরোত্তর কালে আত্মমুখী না থেকে মার্ক্সবাদের মর্মবস্তুকে আত্মস্থ করে গণমুখী হতে প্রয়াসী।
(১৭) গ্রাম্য অশিক্ষিত কবিদের এ ধারার মাধ্যমে লোকশিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য ছিল এবং তা পরিবেশিত হতো আনন্দপূর্ণ উপায়েই।	(১৭) অধুনা গণশিক্ষা যন্ত্রসভ্যতার ফসল। নিত্য নতুনকে সাদরে বরণ করে নেবার প্রয়াস সার্থক হতে চলেছে। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা সমাজ এবং জীবনকে পরিপূর্ণভাবে দেখবার যেমন সুযোগ পেয়েছেন, তেমনি মানুষের আচরণকে বিশ্লেষণ করে মানবচিত্তে সাড়া জাগাবার মতো বিশ্বাস সৃষ্টিতে তৎপর।

(১৮) পল্লী সাহিত্য সারল্যে ভরা। (১৮) নাগরিক সভ্যতার আলোকে শিক্ষিত ব্যক্তি-প্রতিভায় সৃষ্ট সর্বহারার সাহিত্য।

মুদ্রাযন্ত্র অপরিমার্জ্জিত লোকসাহিত্যকে কণ্ঠে ধরে রাখার কঠোর শ্রম-কৌশলকে নিঃসন্দেহে ভারমুক্ত করেছে। বরুণকুমার চক্রবর্ত্তীর কথায় বলা চলে : "শিক্ষিত সমাজের মধ্যে 'লোক-সাহিত্য' ও 'সংস্কৃতি' বেশ উল্লেখযোগ্য আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। বহু পণ্ডিত ও গবেষক 'লোকসাহিত্য' ও সংস্কৃতি'র চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লোক-সাহিত্য' ও সংস্কৃতির পঠন—পাঠক্রম শুরু হয়েছে" ১

জয়দেব থেকে মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিরা তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যের স্বীকৃতি যে পেয়েছেন, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

লোকসাহিত্যের কবিদের অশিক্ষিতপটুত্বে সীমিত জ্ঞানভাণ্ডার বলেই, নব নব ভাব ও প্রকরণের এবং সংযোজনের কৌশলশিক্ষার আলো তাদের মনে যথেষ্ট পৌঁছয়নি। আটপৌরে ভাষায় তাদের গাথা, গান ও উপকথা গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রিত ধারায় মুখে মুখে পরিবেশিত হতো। ছড়াও গতিময় সেই স্রোতধারায় ভাসমান একটি কনিকা মাত্র। "যে লোকমানস থেকে লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা উৎসারিত হয়েছে, সেই একই লোকমানসের ফসল 'ছড়া'।...... ছড়ার ভাষা সমকালীন মানুষের মুখের ভাষা, উপভাষার প্রভাব তাই এতে সহজেই চোখে পড়ে" ২

বিদগ্ধ রসিক ব্যক্তিগণের সৌজন্যে সেই সাহিত্য পুঁথিপুস্তকে স্থানলাভ করায় পুরানো গৌরব সম্পূর্ণ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়নি। লোক কবিদের কয়েকটি রচনার কিয়দংশ :

"আগাডোম বাগাডোম ঘোড়া ডোম সাজে
ডাল মিরগেল ঘাঘর বাজে" ৩

"আয়রে আয় চাঁদ মামা
টি দিয়ে যা ——
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা" ৪

---

১. শ্রীবরুণ কুমার চক্রবর্ত্তী। বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস। পৃঃ ১২। ১ম সংস্করণ : শ্রীপঞ্চমী ১৩৮৪

২. ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক। বাঙলা ছড়ার ভূমিকা। পৃঃ ২৫—৮২। ১ম খণ্ড : সমীক্ষা। ১ম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭৯

৩. ভবতারণ দত্ত। বাঙলা দেশের ছড়া। পৃঃ ১১। ১ম প্রকাশ। ভাদ্র ১৩৭৭

৪. ঐ । ঐ । "২৩। ঐ । ঐ

"এত টাকা নিলে বাবা ছাঁদনা তলায় বসে
এখন কেন কাঁদ বাবা গামছা মুখে দিয়ে
আমরা যাব পরের ঘরে পর অধীন হয়ে
পরের বেটা মুখ করবে মুখনাড়া দিয়ে
দুই চক্ষের জলপড়িবে বসুধারা দিয়ে।" ৩

"আয় পাখী লেজ ঝোলা
তোকে দিব দুধ কলা।" ৬
"আয় বৃষ্টি বসে
আমরা থাকি বসে
যা বৃষ্টি ধরে যা
লেবুর পাতা করঞ্চা।" ৯

গ্রামীন-জীবন ছড়া, কবিতা, গানের ধারায় লোকসাহিত্যে রূপায়িত। সেখানেই লোক-মন সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিল। আবার গ্রামীন মানুষের বড় আপন জন ছিল এই সব লোক কবি।

এদের কামনা বাসনা এবং গতায়াত ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই। বৃহত্তর ভাবনা এবং বিরাটের সঙ্গে পরিচয়ের স্পর্ধা এখানে নেই। সেই কারণে গণ-সাহিত্যের সচেতন সমপ্রাণতা, বোধ-সৃষ্টি, 'রূঢ় বাস্তব' লোক সাহিত্যের রসে দুর্লভ। তবু শিক্ষা সংস্কারের বাইরে থেকেও হৃদয়ের সামগ্রিক অনুভূতির সাক্ষ্য রাখতে এদের প্রয়াস যে নিষ্ফল হয়নি, সেকথা অতি সত্য। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত অভিমত-গুলি স্মরণ যোগ্য : "কিন্তু সমাজের উপর দিয়া মৌখিক প্রবহমান লোক সাহিত্য চিরদিনই নূতন, ইহার বহিরঙ্গেও কোনদিক দিয়াই জীর্ণতা স্পর্শ করিতে পারে না। ইহার কারণ, যাহা চির পরিবর্তনশীল, তাহা কখনও প্রাচীন হয় না, লোকসাহিত্য ও তাহাই।" ৪

"By the word 'Folk lore' a folk-lorist means—myths Legends, Folk tales, proverbs, riddles, Folkverses Folk beliefs Folk superstitions, Customs, Folkdrama, Folksong, Folkmusic, Folkdance, ballads Folkcults, Folkgods, and Goddesses, rituals, festivals, magic, witch-craft, Folkart and craft and a variety of forms of artistic exprssion of oral cultural or

৩. ভূতোরণ দত্ত | বাঙলা দেশের ছড়া | পৃঃ৮১ | ১ম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৭৭
৬. ঐ | ঐ | "৮১ | ঐ | ঐ
৯. ঐ | ঐ | "২৮ | ঐ | ঐ
ঐ ঐ | ঐ | "৬৭ | ঐ | ঐ
৪. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য | বাঙলার লোক-সাহিত্য | পৃঃ ২৮ | ১ম খণ্ড | ৩য় সংস্করণ | ১৯৬২

rural and tribal folk or 'unlettered' Citydewellers that bind man to man. This aceount of Folklore study in Bengal is a preliminary one." 1

"অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাহিত্য দু-স্তরের। এক, যা লোক (Folk)- সমাজের সামগ্রিক চেতনায় ফসল, সমষ্টিগত ভাবে সৃষ্ট এবং ভুক্ত সাহিত্য ; এবং দুই, কোন এক ব্যক্তির— তিনি সমাজবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও—একটি হৃদয়-চৈতন্য থেকে জাত, একক ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি—পুষ্ট শিক্ষা—সাপেক্ষ সচেতন সাহিত্য প্রয়াস। প্রথম শ্রেনীকে আমরা লোকসাহিত্য (Folk litealure) এবং দ্বিতীয় শ্রেনীকে আমরা উচ্চতর সাহিত্য (higher-literature) বলতে পারি।" ২

শুধু পল্লী-স্নাত অনুরাগের ভিতরেই গণজীবনের প্রবেশ ঘটেনি। ব্যক্তির সমবায়ে গড়া সমগ্র জীবনের প্রতিফলন গণসাহিত্যে গণকল্যাণ - মুখী। এক কথায় সচেতন সর্বজনের সম্মিলিত জীবন-কথায় সৃষ্ট গণ-সাহিত্য। প্রসঙ্গত: প্রশ্ন জাগে আমরা কি গণ-সমাজের জনগণ? সাধারণত দেখা যায়, বিংশ শতাব্দীতে সাহিত্য গণ-সেবায় আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে। জনগণ আজ যন্ত্রাশ্রিত ধনতান্ত্রিক সমাজ থেকে উত্তরণের পথ যে ভাবে খুঁজছে, সেই দৃষ্টান্ত লোকসাহিত্যে আশা করা নিরর্থক।

সভ্যতার রূপ পরিবর্তনশীল। সেই কারণে সাহিত্য-সেবীদের মানসিকতারও পরিবর্তন। গণ-জীবনের রুচি ও চাহিদার পরিবর্তন ভাষার ক্ষেত্রেও থেমে থাকেনি। গণতান্ত্রিকতা রক্ষার জন্য তারও পরিচ্ছদ পাল্টে গেছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের বিশেষ ভাবে সচেতন থাকা দরকার ভাষার ক্ষেত্রে। রেস্তোরাঁ, হোটেল বস্তি, গ্রাম কিংবা চৌরাস্তার আবরণমুক্ত শিথিল ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দেবার গণতান্ত্রিক অধিকার দিলে গণজীবন_সম্ভব রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের মর্যাদাও একদিন ক্ষুণ্ন হবার সম্ভাবনা। ভাষাপ্রীতির অর্থ অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। এমন সম্ভাবনার দুর্বলতা ঠেকাবার জন্য গণসাহিত্য সৃষ্টির পাশা পাশি গণ শিক্ষার দ্বারা নিরক্ষরতা দূরীকরণ আজকের প্রথম এবং প্রধান করনীয় কাজ।

যতদিন না এই শিক্ষা ব্যবস্থায় অজ্ঞানতা দূর হবে, ততদিন গণসাহিত্যের গণ-তান্ত্রিক আবেদন ফলপ্রসূ হতে বাধা পাবে। গণ-শিক্ষার সঙ্গে দারিদ্র্য মুক্তও করতে হবে জনগণকে।

1. Sankar Sengupta | A Survey of Folklore Study in Bengal, West Bengal and Pakistan | Page 38। First Print। 15th Sept 1967।
2. শ্রীসনৎকুমার মিত্র | রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য | পৃ: ২|প্রথম প্রকাশ। রথযাত্রা ১৩৭৮।

NORTH BENGAL
UNIVERSITY LIBRARY
RAJA RAMMOHUNPUR
97658
13 MAY 1988

কারণ সাম্প্রতিক প্রকাশিত এক তথ্যে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় 'বর্ত্তমান ভারতের সামগ্রিকরূপ'।

১৯৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে মোট জনসংখ্যার ৪৬ শতাংশই রয়েছে দারিদ্র্য সীমার নিচে। গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৪৮ ভাগ মানুষ এই হত দরিদ্রের দলে। তুলনায় শহরের অবস্থা কিছুটা ভালো। সেখানে ৪১ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এইচ, এম, প্যাটেল এই হিসাবটি তুলে ধরে বলেন :

"এর অর্থ ভারতের ২৯ কোটি লোকের মাসিক আয় এখানকার মূল্যমানেই ৬০ টাকার কম। এ ছাড়া দরিদ্রের সংখ্যা প্রতি বছর ৫০ লক্ষ হিসেবে বেড়ে চলেছে। এ বিপুল দারিদ্র্যের কারণ প্রথমত বেকারী এবং দ্বিতীয়ত যাঁরা কর্মে নিযুক্ত তাঁদের অধিকাংশেরই আয়ের স্বল্পতা।" ১

ফলে সমরোত্তর কালে মানুষের জীবনযাত্রার সমস্যা এবং চরম দুর্দশার চিত্র প্রভাবে সাহিত্য প্রকৃতি একটা স্বাভাবিক প্রতিবাদের সুরে সোচ্চার।

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে জনগণ আর নিছক ললাট লিখনের প্রতীক্ষায় থাকতে পারে না। যেখানে সোভিয়েত দেশ যুদ্ধ প্রচার-নিষিদ্ধ করেছে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সেখানে সামাজিক মেলামেশার সুযোগ পাবে বলে সুনিশ্চিত আশ্বাস দিয়েছে, তখন অন্যান্য বিবেকবান দেশ-নেতাদেরও ঐ ভাবনায় জাগতে হবে। এ ঘটনা পরীক্ষিত সত্য।

একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি :

"সোভিয়েত দেশ শ্বেত, শ্যামল, কৃষ্ণ, পীত সকল জাতির স্বচ্ছন্দ বাসভূমি।" ২

সাম্যবাদী সংস্কৃতির মাধ্যমেই জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব। জার্মানিতে জন্মে বের্টোলট ব্রেখট্ মানুষের মনোজগতের জ্বালা যন্ত্রণার পরিচয়-ব্যাপ্ত মন্বন্তর এবং মড়ক সম্পর্কে যে জ্ঞান আহরণ করলেন তা তাঁর নিজস্ব ভাবনায় দেশজ ভাষায় রূপ দিলেন কাব্যনাটকে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ব্রেখট্ উত্তর পুরুষের জন্য রেখে গেলেন তাঁর জীবনের উপলব্ধির সম্ভার।

বর্ত্তমান যুগ, সন্দেহ করার যুগ। কিছু লোকের মর্জির উপর বেঁচে থাকাটা ওঠা নামা করছে। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার উপহার নিম্নোদ্ধৃত লেখায় :

"সত্য বটে আমি আছি অন্ধকার যুগে।

... ...আজ যে হাসতে পারে

---

১. অশোক কুমার সরকার। আনন্দবাজার পত্রিকা। তৃতীয় ডাক। ২৬শে অক্টোবর/১৯৭৮।

২. গোপাল হালদার। সংস্কৃতির রূপান্তর। পৃঃ ১৮। সপ্তম সংস্করণ/১৯৬৫।

সে বুঝি বা শোনেনি এখনও/ভীষণ, সব সংবাদ।
... ...
আমাদের এ কী যুগ।
... ...
কিন্তু কি করেই বা এ মুখে খাই দাই
যখন আমার অন্ন ক্ষুধার্তের মুখ থেকে ছিনিয়ে যোগাড় করা
যখন আমার জলের গেলাসে তৃষিতের অধিকার।
... ...
মানুষের মধ্যে আমার আসা যে গণউত্থানের লগ্নে
আর আমিও যে বিদ্রোহী।
... ...কিন্তু আমি না থাকলে/শাসকেরা আরেকটু নিশ্চিত হত।
... ...
তবুও, তোমরা, যেদিন শেষটায় সহজ হবে
মানুষের পক্ষে সব মানুষকে হাত এগিয়ে দেওয়া
সেদিন তোমরা আমাদের বিচার করো না
খুব একক কর্কশতায়।।" ১

Mathew Arnold আধুনিক সাহিত্য বলতে 'The criticism of life' বুঝেছিলেন। কিন্তু এদেশের লোকসাহিত্যের রচয়িতারা শ্রেণী-জীবন-সমস্যার উৎস সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে খুবই ওপর থেকে সমাজ জীবনের দুঃখকষ্টের বৃত্তান্তকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছেন। কিন্তু রাশিয়ার লোক কথায় জানা যায়, গৃহকর্ত্রীর অসহ্য পীড়নে পরিবার-পরিজনহীনা 'হেভোরচেকার' কান্নায় ভেঙে প'ড়ে, বয়োভারে পীড়িত গরুকে জড়িয়ে ধ'রে সান্ত্বনা প্রার্থনা করছে। *

আমানবিক নির্যাতনের যে তথ্য একটি মেয়ের অশ্রু জলে পাওয়া যায়, সেখানে মূক বধির চতুষ্পদ গরুর মন পর্যন্ত না গলে থাকতে পারেনি। তাই সে-ও

১. বিষ্ণু দে। রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা। পৃঃ ৯১-৯৩। ১ম প্রকাশ ১৯৬৬

* "Brindled, my dear." They beat me and scold me. They don't give me enough to eat, and yet they forbid me to cry. I am to have five poods of flexspun, woven, bleached and rolled by tomorrow.

সান্ত্বনার সুরে পথ নির্দ্দিশ দেয়। *

এই ঘটনা বিস্ময় ও হাস্যোদ্দীপক সন্দেহ নাই, তবু পরোক্ষভাবে যে জ্ঞান বিতরণ করে তা জীবন-বেদেরই নামান্তর। কারণ গল্পের শেষ পর্যন্ত সব রকমের কষ্ট হাসিমুখে বরণ করতে পেরেছিল বলেই তো, কর্ম্ম সাধনার মধ্যে দিয়ে রাজকুমারের জীবন-সঙ্গী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল উপেক্ষিত মেয়েটি।

রাশিয়ার লোকসাহিত্য কল্পনা-সর্বস্ব নয়। বাস্তব পরোক্ষভাবে অনুপ্রবেশ করেছে এখানে। যন্ত্রণার ভীষণতার ভিতর মানুষ মুক্তি চায়, চায় সুস্থ জীবন যাপনের মতো অন্ততঃ একটা আশ্রয়। **

'বাঙলার মতো সর্পপূজার বিষয় কেন্দ্রিক লোকসাহিত্যের সঙ্গে রাশিয়ার ইউক্রেনের মিল কিছুটা রয়েছে তবে সেই কাহিনীর নায়িকা সর্পকে বিনষ্ট করেছে আর আমাদের সাহিত্যে দেখা যায় সর্পদেবীর আধিপত্য। মাতৃরূপে পূজা পাবার আশায়, একনিষ্ঠ ভক্ত তৈরী করে। লোকসাহিত্যের পর্দ্দায় একটি জাতির অন্তর্লোকের সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করি।' ***

'রূপকথা' প্রসঙ্গে এবার শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যবান কথা শোনা যাক:

"আমাদের লৌকিক গল্প ও রূপ কথার মধ্যেও উপন্যাস—সাহিত্যের বিস্ময়কর পূর্ব সূচনা পাওয়া যায়। বাস্তবিক প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে রূপকথাই উহার অবাস্তবতা সত্ত্বেও উপন্যাসের দিকে সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়াছে। অন্ততঃ দুইটি দিক দিয়া উপন্যাসের সহিত ইহার সাদৃশ্য বেশ স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। প্রথমতঃ উপন্যাসের মতই ইহার আখ্যান ভাগ ইহার সর্ব প্রধান বিষয়বস্তু ও আকর্ষন; ইহা একটি খাঁটি অবিমিশ্র গল্প—ধর্মকাব্যের মত ইহার গল্পাংশটি শুধু কোন ধর্মতত্ত্ব প্রমাণ বা দেবতার মাহাত্ম্যকীর্ত্তনের উপায় মাত্র নহে। দ্বিতীয়তঃ উহার

---

*. My bonny lass, you have only to climb into one of my ears and come out through the other, and your work will be done for you.

**. রুশ প্রেক্ষাপট দেখলে দেখা যাবে-তার বিশেষ রূপটা হচ্ছে ভূমিদাস প্রথা বা 'সার্ফডম-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, রুশ সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রগতিকামী মানুষের বিদ্রোহ; সেই সঙ্গে মানুষের গ্লানিমুক্ত উন্নত সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনের স্বপ্ন।

***. সুশীলকুমার ভট্টাচার্য। বিশ্বলোকসাহিত্যের ধারা গ্রন্থের ভাবাংশ। পৃষ্ঠা। পৃঃ ১৯—২০

মধ্যে যথেষ্ট অলৌকিকতা থাকিলেও, উহার আকাশ-বাতাসে মায়া-মোহ-ইন্দ্রজালের একটি ঘণ প্রলেপ থাকা সত্ত্বেও একটু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে লেখক ইহাতে মানুষের লৌকিক ও সামাজিক ব্যবহারেরই পরিণাম দেখাইয়া তাহারই উপর নিজ সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং মূলতঃ উপন্যাসিকেরও যে উদ্দেশ্য, রূপকথার লেখকেরও অনেকটা তাহাই; এবং ধর্মকাব্যকারের অপেক্ষা রূপকথাকার এই উদ্দেশ্য আরও প্রত্যক্ষভাবে, আরও সরল ও প্রবলভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন— ধর্মের কুহেলিকার মধ্যে ইহাকে বিশেষ ম্লান হইতে দেন নাই।" ১

ভিন্ন মানসিকতায় এবং কালের অনিবার্য প্রভাবে লোক-জীবনের সাহিত্য গণ-জীবনে প্রবেশ করে। পল্লীজীবনের কথার সঙ্গে নগর জীবনের কথা মিশে যায়। একপ্রান্ত অপর প্রান্তের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, ভাবের লেনদেন করে। এর ফলে সচেতন-তাই সে সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে ওঠে।

মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের বেশ খানিকটা লোকসাহিত্য যুক্ত। আনন্দের কথা 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকার' মতো অমূল্য রস- সম্পদ শিক্ষিত জন-মনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অকৃত্রিম চেষ্টায় দীনেশচন্দ্র সেন, চন্দ্রকুমার দে, প্রভৃতি বিদগ্ধ ব্যক্তি লোকসাহিত্য সংগ্রহ করে বাঙলার অতীত ঐতিহ্য উদ্ধার এবং রক্ষা করেছেন। তবু একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে পুরানো লেখা ত্রুটি মুক্ত করার জন্য সংগ্রহকারীদের কলম প্রয়াসী হওয়ায় আসল রূপের কিছু পরিবর্তন ও ঘটেছিল। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনায় ডঃ সুকুমার সেন এবং ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য)। সিদ্ধাচার্যগণের চর্যাগীতিতে এবং নাথসাহিত্যের পৃষ্ঠায় বাঙালীর সংস্কৃতি সজীব। সংসার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা মুকুন্দ চক্রবর্তীর মঙ্গলকাব্যে আঁকা রয়েছে। এসব লিখায় অন্যান্য কথার আড়ালে আড়ালে পরোক্ষভাবে অত্যাচারী এবং অত্যা-চারিতের স্বতন্ত্র শ্রেনী বিষয়ে একটা সজাগ মন আগাগোড়া জেগে আছে। গণ সাহিত্য না হয়েও মঙ্গলকাব্য এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা গণজীবনের স্বাদ-সমৃদ্ধ। আধ্যাত্মিকতা বিমুক্ত পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রেমের গান গেয়ে মর্ত্যের মানব মানবীর হাসিকান্নার সার্বিক চিত্র তুলে ধরেছে। ~~যেখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে~~ অশিক্ষিত কৃষক-কবির পল্লীগীতিকাগুলো এ ধারার লেখা সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর। এস্থানে বলা প্রয়োজন যে চর্যাগীতি*ক | *20ক

১. শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা। পৃঃ ১২। ৬ষ্ঠপুন-মুদ্রন সংস্করণ ১৩৮০ এ প্রসঙ্গে লেখকের 'রূপকথা' প্রবন্ধটিও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

*ক. শ্রীসুকুমার সেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। প্রথম খণ্ডপূর্বার্ধ। পৃঃ৬৫/৫ম সংস্করণ১৯৭০

এবং নাথসাহিত্য *২ যথাক্রমে তত্ত্বকথা এবং আত্মবাদী হবার পরামর্শ দেয়। উভয়েরই প্রার্থনার ভিতর রয়েছে সাধন সংকেত।

পূর্ববঙ্গ গীতিকায় ভালবাসা জাত মানেনি। মলুয়ার মতো পল্লী প্রেমিকা দুর্বার বাধা লঙ্ঘন করে মহীয়সী। ঝড়, বাদল, কাজির প্রলোভন ঘৃণায় উপেক্ষা করে সেই মলুয়া আমাদের শোনায় :

"ব্যাচা থাকুক স্বামী আমার লক্ষ পরমায়ু পাইয়া।
থানের মোহর ভাঙ্গি কাজি পায়ের লাথি দিয়া॥
জাতের মুসলমান কাজি তার ঘরের নারী।
মনের আপশোষ মিটাক তারা সাত নিখা করি॥
সেইমত আমার যে ভাব্যাছে লম্পটা।
কাজিরে জানাই ও তার মুখে মারি ঝাঁটা॥"

এবং ঐ গীতিকার আর এক বিশিষ্ট নারী মহুয়া। তার পবিত্রতার কথা :

"ছিঃ ছিঃ নিলর্জ্জি ঠাকুর লজ্জা নাইরে তোর" ব'লে ধিক্কার দিলে
প্রেমান্ধ নদ্যার চাঁদ নিসঙ্কোচে উত্তর দেয় :

"কোথা পাইব্যাম কলসী কন্যা কোথা পাইব্যাম দড়ি
তুমি হও গহীন গাঙ, আমি ডুইব্যা মরি।"

মলুয়া, মহুয়ার মতো কাঞ্চনএ বং কাজল রেখার ধৈর্য সহিষ্ণুতায় মুগ্ধ এবং চমৎকৃত না হয়ে পারা যায় না। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে লোকসাহিত্য তাকেই বলা যাবে :

"যাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ মানবিক আবেদন থাকিবে সেইগুলোই লোকসাহিত্যের পর্যায়ে স্থান পাইতে পারে। আধ্যাত্মিক সাধনার বিশিষ্ট একটি প্রণালীর নামই বাউল, যাহারা এই প্রণালীর সাধক তাহাদিগকে বাউল বলে। ইহা একটি আধ্যাত্মিক অনুভূতি বিশিষ্ট প্রণালীর সাধকদিগের নিকটই এই অনুভূতির উপলব্ধি হয়।" ১

২**শ্রীসুকুমার সেন। বাঙ্গলাসাহিত্যের ইতিহাস। প্রথম খণ্ডপূর্বার্ধ। পৃ:৭৬/৫ম সংস্করণ১৯৭০

*চর্যাগীতিগুলি তত্ত্ব-সাধনাঘটিত পারিভাষিক শব্দে কণ্টকিত ও লৌকিক অনির্বচনীয় উৎপেক্ষায় আকীর্ণ, কিন্তু গান বলিয়া রসহীন নয়। এই চর্যাগানগুলির আসল উদ্দিষ্ট গভীর ব্যঞ্জনা। সেই ব্যঞ্জনায় তাঁহাদের সাধন-সংকেত দ্যোতিত।

** নাথ-পন্থীযোগীরা এই ঐতিহ্যের অধিকারী। তাঁহাদের লেখার মধ্য দিয়া চর্য্যাগীতির কোন কোন বস্তু সাধারণ সাহিত্যেও অজ্ঞানিতভাবে প্রবেশলাভ করিয়াছিল।

১. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। বাঙলার লোকসাহিত্য | পৃঃ ৪৯-৫০ | ১ম খণ্ড | ৩য় সংস্করণ | ১৯৬২

সুশীল কুমার ভট্টাচার্যের মতে :

"লোকসাহিত্য ও বাউলের মধ্যে ভাবগত ও প্রকৃতিগত কোন সত্যিকারের অলঙ্ঘণীয় দূরত্ব নেই।" ঐ

এ প্রসঙ্গে 'বাউল' সম্পর্কে শশিভূষণ দাশগুপ্ত এবং ক্ষিতিমোহন সেনের ব্যাখ্যা বিশেষ অভিধান যোগ্য : ১

"These unlettered Village—Singers, belonging to the lower ranks of the Muslim and the Hindu Communites of Bengal and Composed partly of house-holders and mainly of mendicants, are Known as the Bauls. The Bauls belonging to Hindu Community are generally vaisnavite in their faith and those belonging to the Muslim Community are generally sufi-istic and in both the Schools the emphasis is on the mystic Conception of divine love." 1

দৃষ্টান্তস্বরূপ :

"ujān jale pādi dhara reguruāmār ghotlanā ।
bhaver naukā khāni ura-duvuguru pādi pelemnā ॥" 2

বাংলা : উজান জলে পাড়িধরা রেগুরু আমার ঘটলো না।
ভবের নৌকাখানি উব ডুবো গুরু পাড়ি পেলাম না ॥"

"বাউল বা বাতুল কথার অর্থ ও পাগল। বাউলরা তাই গান করেন
তাইতো বাউল হৈনু ভাই।
এখন বেদের ভেদ-বিভেদের
আরতো দাবি-দাওয়া নেই।
লোক-চলাচলের পথ বন্ধ্যা। তাতে ঘাসটুকুও জন্মাতে পারে না
গতাগতের বাংঝা পথে,
আজায় না ঘাস কোনো মতে।

ঠ. শ্রীসুশীল কুমার ভট্টাচার্য। বিশ্বলোক সাহিত্যের ধারা | পৃ: ১২ | ১ম প্রকাশ রাখিপূর্ণিমা ১৩৭৪

1. Sashibhusan Dasgupta | Obscure religious cults (As Back ground of Bengali litrature) | page 1831 university of calcutta | 1946 ৰাং
2. Do | Do
Do | page 1851 Do | Do

এই লোকাচারের বন্ধ্যাপথে বাউলরা অগ্রসর হতে নারাজ। তাই তারা লোক-প্রচলিত বিধিও মানে না, আবার প্রাণহীন অবাস্তব তত্ত্বও বোঝে না। তারা চায় মানুষ; কিন্তু সে মানুষ আস্ত মানুষ, যে সমাজের ভগ্নাংশ নয়। সেই পরিপূর্ণ মানুষই ব্যক্তি, ইংরাজিতে যাকে বলে পার্সনালিটি। তার মধ্যেই সে সব।

আস্ত অস্ত এই মানুষ বাইরে কোথাও নাই। সমাজের ভগ্নাংশ যে মানুষ সে অবাস্তব তত্ত্বের মতই অলীক। আস্ত যথার্থ মানুষকেই মন চায়। তত্ত্বে ফত্তে মন মানে নয়, মনের মানুষ চাই ই চাই।"[১]

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সমাজের সঙ্গে এঁদের (বাউলদের) নাড়ির নিবিড় সম্পর্ক। সহজ মানুষ বাউলরা শাস্ত্রগত সংস্কার মুক্ত বলেই নিজেদের জন্য একটা স্বতন্ত্র জগৎ সৃষ্টি করে। সেখানে মন সংস্কৃত হয় দর্শন (Soul Sight) লাভে। আর এই দর্শন ও সাধনা বিশ্বসত্যের শীর্ষে। মানুষের মনোলোকের সুষ্ঠু পরিশুদ্ধির জন্য এদের আকুল প্রার্থনা:

"আমার আঁখি হইতে পয়দা
আসমান আর জমিন!"

কিংবা "রূপ দেখিলাম রে
নয়নে আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাঝত বাহির হইয়া
দেখা দিল আমারে!"

কিংবা "আমার মনের মানুষ যে রে, আমি কোথায় পাব তারে।" সুখ বাউলের কাম্য নয়। প্রেমের পথে এদের জীবন-পণ শ্রম। সে পথেই ভগবান মিলবে। কিন্তু স্বার্থান্ধ মানুষ ভগবানের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে বলেই তাঁদের বিশ্বাসের ফল হিসাবে শুনতে পাই:

"মন্ত্রে তন্ত্রে পাতলি যে ফাঁদ
দেবে সে কি ধরা?"

বোধ করি সেই কারণেই ভগবানকে বলতে পারে তারা:

"যদি আমায় ছাড়া ওগো রসিক
তোমার প্রেমের লীলা চলে

---

১০ ক্ষিতি মোহন সেন। বাংলার সাধনা। পৃ: ৭৭-৭৮। আষাঢ় ১৩৫২। বিশ্বভারতী গ্রন্থমালায়।

তবে এখান থেকেই দাও গো বিদায়
আমি বসব না তা বলে।"

খ্যাতি প্রতিপত্তির প্রতি এদের কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। জীবন ও পূজাকে পৃথক করতে চায়নি তারা। মানবতত্ত্বই তাদের মূল অবলম্বন। বাউল গান মনে হয় এই কারণেই আপন স্বাতন্ত্র্যে পৃথক। এগুলিকে লোকসাহিত্যের লক্ষণযুক্ত বিশিষ্ট অধ্যাত্মবাদীর গোষ্ঠী গান বলাই সংগত। এগুলি বিশুদ্ধ লোকসাহিত্যও নয়, আবার নিছক ব্যক্তি-রচনাও নয়।

'গণজীবন' বিংশশতাব্দীর বাঙলাকাব্যে কিভাবে অনিবার্য হয়ে উঠেছে তার সামগ্রিক আলোচনা করার পূর্বে গণসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। এখন প্রশ্ন গণজীবনভিত্তিক যে সাহিত্যকে গণসাহিত্য আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে তা কি আদৌ সৃষ্টি করা যায়? একথা সত্য, সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকেন এক শ্রেণীর শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী! তাঁরা যখন গণজীবন দেখেন, তখন তাঁরা তাঁদের নিজেদের সংস্কারের দ্বারস্থ হন। হয়ত সে সব লেখা তত্ত্বের দিক থেকে গণজীবন যতখানি উচ্চারিত, বাস্তবে ঠিক ততটা প্রতিফলিত হচ্ছে না। তবে আশার কথা এই যে আজকের সাহিত্যে সবচেয়ে বেশী স্থান জুড়ে আছে মানবতাবাদ কথাটি।

প্রাচীনকালে কবিরা যে মানুষদের সাহিত্যে এনেছিলেন, আধুনিক প্রগতিপন্থী লেখকদের সাহিত্যে সেই নিরক্ষর মানুষগুলোকেই ফের নতুন মূর্তিতে দেখতে পাই। উভয়কালের মানুষদের জীবিকার পথ ভিন্ন হলেও সামাজিক-স্তর-পার্থক্যে এদের মধ্যে খুব একটা দূরত্ব নেই।

যুদ্ধোত্তর কালে ধনিক সম্প্রদায় সৃষ্ট অর্থসংকট এবং মধ্যবিত্তের নিদারুণ দুর্দশা ইউরোপীয় সভ্যতার ক্ষেত্রেও প্রকট। ফলে মার্ক্সের প্রদর্শিত পথ যুগধরা সমাজের প্রতি আস্থা হারানো তরুণ মনীষিদের অনুপ্রাণিত করে। সৃষ্ট-প্রথার সনাতন গণ্ডী ভেঙ্গে সাহিত্য স্থানান্তরিত হয় তাদের হাতে। অবশ্য এ ঘটনা আকস্মিক কিছু নয়। কবিতার অবয়ব বদলে যায় জীবনের তাগিদেই। ম্যালার্মেকে (Mallarme) এবং প্রুস্তকে (Proust) সাহিত্যে মৌলিক পরিবর্তন আনার ব্যাপারে পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। এজরা পাউণ্ড; ডি, এইচ, লরেন্স; উইণ্ডহ্যামলইস, টি, এস, এলিয়ট; পি, বি, শেলীও পৃথক পৃথক ভাবে তারই স্বাক্ষর রাখেন।

স্বার্থের সংঘাতে যে দুটো যুদ্ধ মানব সভ্যতাকে মসীলিপ্ত করেছে, তারই অভিজ্ঞতায় বলিদানের সেই কলঙ্কিত রক্ত-ভূমিতে মানুষ আর জীবনকে অর্থহীন পৈশাচিকতার মধ্যে উৎসর্গ করতে দেবে না। সাহিত্য স্রষ্টারাও তো এই হতভাগ্যদেরই একটা অংশ। তাই শাসন শোষণের প্রতিকূলে সেই অভিজ্ঞতাপুষ্ট সচেতনতা সত্য

হয়ে উঠতে চায় আজকের সাহিত্য। তাই লেজবুড়িকে দূরে রেখে, অন্ধকারের আড়াল থেকে গণজীবনকে সর্বসমক্ষে আনবার প্রয়াস। সমাজের বৃহত্তর অংশের প্রতি এদের অকৃত্রিম আন্তরিকতাই গণশিল্পরূপায়নের বড়ো পুঁজি। চিন্মোহন সেহানবীশ বলেছেন :

".....আমাদের মতো নিরক্ষরতার দেশে লেখক ও শিল্পীরা হলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী উদ্ভূত। গোর্কির মতো নিপাড়িত শ্রেণী থেকে সাহিত্যিকের আবির্ভাব অনেক কঠিন "১

বর্তমান বিশ্বের দুই শত রাষ্ট্রের মোট লোকসংখ্যা আনুমানিক তিনশত সত্তর কোটি। সুতরাং সমস্যা পর্বত সমান। পুঁজিবাদী সমাজে সংঘাতের বীজ অলক্ষ্যে থাকবেই। তবু জীবনের সর্ববিধ প্রতিকূলতা অতিক্রম করে মানুষের স্বমহিমাকে বলবতী করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্ম কিন্তু এই এশিয়ার মাটিতেই।

মজফ্‌ফর আহমদের ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় : "১৯১৭ সালের মার্চ রাশিয়ায় যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয় তাতে জারের পতন ঘটে। তার পাঁচ মাসের ভিতরে যে মন্টেগু ভারতকে দায়িত্বপূর্ণ শাসন ক্ষমতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন তার পেছনে এই বিপ্লবেরও কিছু প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়ায় সর্বহারা বিপ্লব সফল হয় এবং তার ফলে মজুর শ্রেণীর পার্টি-কমিউনিস্ট পার্টির অধিনায়কত্বে মেহনতী জনগণের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ... ... রুশ বিপ্লব আমাদের দেশের মজুরদের সামনেও আশার আলো তুলে ধরেছিল। মজুর সংগ্রামের ভিতর দিয়েই ১৯২০ সালে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।"

মহাচীন এবং ভিয়েতনামেও ঐ একই প্রয়াস সারা দুনিয়ার মানুষকে অনুপ্রাণিত করার মতো একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত।

চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম' প্রবন্ধে লিখেছেন : "চীনও আমাদেরই মতো অক্ষরজ্ঞানহীন—দারিদ্র্যের প্রচণ্ডতাও এক পর্যায়ের। সেখানে নবজীবনের উন্মেষে শিল্প-সাহিত্যিকের ভূমিকা সম্পর্কে রাষ্ট্রনায়ক মাওসে-তুং অত্যন্ত আস্থাশীল। তিনি বলেছেন আমাদের ফ্রন্ট দুটোই-সামরিক ও সাংস্কৃতিক এবং দুটো পরস্পর মুখাপেক্ষী। কিন্তু ঠিক ফ্রন্টের মতো করেই শিল্পী সাহিত্যিককে দায়িত্ব অর্জন করতে হবে—লক্ষ্য স্থির সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে হবে।" ৩

কালের অমোঘ প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি বলেই ইউরোপের সভ্যতার

---

১. মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক-২ | ধনঞ্জয় দাশ | ২য় খণ্ড পৃঃ ২৪৬ | মার্চ ১৯৭৬ | ১ম প্রকাশ

২. মজফ্‌ফর আহ্‌মদ | আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯২০-১৯২৯) | ১ম মুদ্রণ | ডিসেম্বর ১৯৬৯।

৩. মার্ক্সবাদী সাহিত্য বিতর্ক | ধনঞ্জয় দাশ | ২য় খণ্ড | পৃঃ ২৪৭ | মার্চ ১৯৭৬।১ম প্রকাশ

বিপ্লবালোকে আবর্তিত হতে থাকে সারা বিশ্বের মনুষ্য-সভ্যতা। রবীন্দ্রনাথের উক্তি *

সমষ্টা সৃষ্টিকারী মুষ্টিমেয় লোকের সুখকে প্রশ্রয় না দিয়ে বৃহত্তর জনসমষ্টির স্বার্থের কথা ভাবছেন দেশ প্রেমিকরা। গতিশীল জীবনের পথ রুদ্ধ থাকতে পারেনা। হয়তো একদিন আশাবাদীরা সেই দুর্ভাবনার অবসান ঘটাবেন। বুদ্ধিজীবীদের ঘুমন্ত বিবেক জাগ্রত হবে। এই কারণে যুগে যুগে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। রমাঁ রোলাঁ সোভিয়েত বিপ্লবকে উপলক্ষ করে বলেছিলেন :

"আমার সমস্যা ছিল স্বাধীন বুদ্ধিজীবীদের কর্মক্ষেত্রের সহিত সর্বহারা শ্রমজীবীদের কর্মক্ষেত্রের সংযোগ সাধন। ··· ···সর্বহারা যে পথ প্রস্তুত করিবে তাহাকে আলোকিত করাই বুদ্ধিজীবীদের কাজ।" ১

বলা বাহুল্য 'when Adam delved and Eve span
who was then Gentleman ?'

তখন আমরা মানুষের সাক্ষাৎ পাই। এই মানুষ নিরলস শ্রমের মধ্য দিয়ে এক একটা যুগ পেরিয়ে জীবন যাপনের প্রয়োজনেই ভূমি চাষ, অন্ন গ্রহণ, স্তব পাঠ, শারীর বিদ্যা শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে সেই মানুষ মনঃপুত নগর পত্তন, সুরম্য অট্টালিকা তৈরী, নদীবন্ধন, আকাশ, সমুদ্র পাড়ি এবং চাঁদ, মঙ্গল শুক্র গ্রহের রহস্য ভেদ করে। তবু অতীত যেন চিরবন্দিত। তাই সাহিত্য ও তার কৃতকর্মের ফলভোগ করছে সমভাবনার পরিচয় দিয়ে।

---

* "আজকের দিনে বিশ্বমানবকে আপনার বলে স্বীকার করবার সময় এসেছে। আমাদের অন্তরের অপরিমেয় প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা এই কথা জানতে হবে যে, মানুষ শুধু কোন বিশেষ জাতির অন্তর্গত নয়; মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে, সে মানুষ। আজকার দিনে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে, মানুষ সর্বদেশের, সর্বকালের। তার মধ্যে কোনো জাতীয়তা বা বর্ণভেদ নেই। সেই পরিচয় সাধন হয়নি বলেই মানুষ আজ অপরের বিত্ত আহরণ করে বড়ো হতে চায়। সে আপনাকে মারছে, অন্যকে মারতে তার হাত কম্পিত হচ্ছে না—সে এত বড়ো অপকর্ম করতে সাহস পাচ্ছে।" —রবীন্দ্র রচনাবলী। জন্ম শত বার্ষিক সংস্করণ। একাদশ খণ্ড : বিশ্বভারতী প্রবন্ধ। পৃঃ ৭৭৬। ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮।

১. নেপাল মজুমদার। ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ। ২য় খণ্ড পৃঃ ৫৭। প্রথম সংস্করণ ১৯৬৩।

'সর্ব্বে লোকা একজাতি নিবদ্ধাশ্চ সহজমেবিতি ভাব' :১

'গুপ্ত প্রকট হৈ এক মূত্রা।
কাকো কহিয়ে ব্রাহ্মণ শুদ্রা॥
ঝুঠ গর্ব ভুলো মতি কোঈ।
হিন্দু তুরুক ঝুঠ কুল হোঈ'।'২

(বাংলা ভাবানুবাদ : গুপ্ত প্রকট একই রূপে প্রত্যেকে রূপায়িত। তবে ব্রাহ্মণ শূদ্রে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। মিথ্যা আত্যাভিমান অর্থহীন। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি জাতিতে জাতিতে সকল প্রকার ব্যবধান তথা ভেদবুদ্ধি মিথ্যা ভুল দিয়ে গড়া। মানুষের মনে এ ধরণের সংস্কার আদৌ প্রশ্রয়যোগ্য নয়।)

কবীরের অধ্যাত্ম-ভাবনার মধ্যে জাতিবর্ণোত্তর এক মানবত্তার যে ভাবনা ছিল, তার সুর রাশিয়ার সাম্যবাদ ভাবনার জন্ম—মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মূল সংকট থেকে। এ চিন্তাপদ্ধতি কবীরের পক্ষে কি সম্ভব ছিল? একথা সত্য এই সম-ভাবনার বিষয়টি পরবর্তীকালে রাশিয়ায় আচরিত হয় সব থেকে বেশী। এক সমপ্রাণতা বোধের উন্মেষ ঘটে সচেতনতা থেকে। আর সচেতনতা চিত্তশুদ্ধির মধ্য দিয়ে মানুষের হারানো প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করে। এ জন্য সর্ব্বপ্রকার সুচিন্তিত পথ ধরে মানুষকে এগোতে দেখা যায়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোতে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রাদগীরণ, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ প্যারিস প্রলেতারিয়েতে দুঃসাহসিক জাগরণ এবং তৎসঙ্গে শাসনাদির সুবিধার্থে রাজ্য বিভাগ ও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় ঐতিহাসিক মহাবিদ্রোহ —এ সবই জাগ্রত বিবেকের দংশনে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এবং এভাবেই তা হতে থাকবে। গান্ধীজীর স্বপ্ন ছিল রামরাজত্ব গড়ার। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এর পরিকল্পনা রূপায়িত করার আগে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'ভূপালে-র' মুসলীম জনসভায় সমক্ষে তিনি রামরাজত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন :

"I warn my Muslim friends against misunderstanding me in my use of the word Ramraj. By Ramraj, I do not mean to Hindu Raj. I mean by RamRaj, Divine Raj the Kingdom of God. For me, Rama and Rahim are one and the same duty."1

---

১০ প্রবোধচন্দ্র বাগচি | দোহাকোষ | পৃঃ ৮৫

২০ ক্ষিতিমোহন সেন | ভারতের সংস্কৃতি | পৃঃ ৬৬

1. D. G. Tendulkar | Mahatma | Vol. II Page 375 | New Edition | March 1961

তাঁর দৃষ্টিতে রামরাজ্য স্থাপন হবে অহিংস নীতির মধ্যে দিয়ে। চরকা কাটা প্রার্থনা কালে গীতাপাঠ এবং ব্রহ্মচর্য পালনের কঠোর ইঙ্গিত ছিল দেশ প্রেমিকের কাছে। অথচ অসহযোগ আন্দোলনের হুংকার তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও কোন ক্রমে ভাবা যায় না যে তিনি তাঁর সংগ্রামী চেতনাকে বাস্তবায়িত করতেই উদ্যোগী হয়েছিলেন সে সময়। তবে তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপিত হক। শেষাবধি এই উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে গিয়ে খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন না করে তাঁর উপায় ছিল না। তাই তাঁকে বলতে শোনা যায়:

"If the Hindus wish to cultivate eternal friendship with Musalmans, they must perish with them in the attempt to Vindicate the honour of I slam." 1

তাঁর এই অসাধারণ সহজিয়া মানবতাবাদ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক দৃষ্টান্ত।

নেপাল মজুমদারের কথায় জানা যায়:

'গান্ধীজী খিলাফত-প্রশ্নে হিন্দু—মুসলিম ঐক্যের অপূর্ব সম্ভাবনা দেখিতে ছিলেন।" ২

গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ অভিযানের মধ্যে ছিল তাঁর অন্তরের সবচেয়ে সত্য পরিচয়। হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামী এবং চিত্ত শুদ্ধির অভাব জনিত সংকীর্ণতা গান্ধীজীর মনকে বিদ্রোহী করেছিল। মনুষ্যত্বের জাগরণের জন্য বক্তৃতা, বানীতে, লেখায় তিনি তাঁর শাশ্বত গণ-জীবন-প্রীতির এর জন্য স্বাক্ষর স্বয় রেখেগেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ দর্শনে যে বোধের উন্মেষ ঘটে সে সম্পর্কে নেপাল মজুমদারের কথা উদ্ধারযোগ্য:

"রেনেসাঁস—রিফর্মেশনের যে যুগান্তকারী দর্শন-চেতনা ইউরোপের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্র ভূমি প্রস্তুত করিয়াছিল, স্পষ্টতই কবি সেই দর্শন ও শিক্ষা-চেতনা জনগণের মধ্যে অবাধ বিস্তারিত করিবার কর্মসূচী গ্রহণ করিতে বলিলেন। বেঙ্গল-রেনেসাঁসের সেই মহানব্রত কে সম্পন্ন করার জন্য কবি অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবর্গের কাছে এমনি করিয়াই বারে বারে আবেদন জানাইতেছিলেন।" ৩

---

1. D. G. Tendulkar | Mahatma | Vol, II Page 44 | New Edition | March 1961
২. নেপাল মজুমদার | ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ | পৃঃ ৭২ ২য় খণ্ড | ১ম সংস্করণ | ১৯৬৩।
৩. নেপালমজুমদার | ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীকথা এবং রবীন্দ্রনাথ | ২য় খণ্ড ১ম সংস্করণ | ১৯৬৩ | পৃঃ ২০০

এ প্রসঙ্গে সরোজ মোহনমিত্রের লেখায় জানা যায়: "কবি দেশবাসীর পক্ষ নিয়ে বলেন যে পাপের মূলগত প্রতিকারের চিন্তা স্থৈর্য যেন আমরা রাখতে পারি।" ১

বিশের দশক থেকেই ভারতবর্ষের মাটিতেও কমিউনিষ্টপার্টি ভূমিষ্ট হয়। গান্ধীজী প্রদর্শিত অহিংসা আন্দোলনের ভিতর শ্রমিক কৃষকের একত্রীকরণের কোন দৃঢ় প্রয়াস না থাকায় শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নব্য-সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের কথা একটু জোরের সঙ্গে ভাবলেন। ফলে আবশ্যিক হয়ে উঠলো সাহিত্য, সংগীত এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন। সম্ভবত ত্রিশের দশকের সমাপ্তিকালে মার্ক্সীয় বিজ্ঞান বিশেষ ভাবে অনুপ্রেরণা যোগায়।

স্বার্থান্ধ যুদ্ধের হানাহানি অসংখ্য প্রাণ বিনাশ ঘটালেও অবিশিষ্ট প্রাণ পুনরায় সুসংহত জাতি গড়ে তোলে। আবার সেই জাতিই সাহিত্যে সঞ্জীবিত হয়।

১৯৩০ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর চেহারাটা যে ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত হয়ে যে বিশেষ অধ্যায় সৃষ্টি করেছে তা রোমহর্ষক। এখানে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের তথ্য সমৃদ্ধ নিবন্ধের আলোচনার দৃষ্টি নিক্ষেপে জানা যায়:

"১৯৩০—৩২ সালে ফ্যাসিষ্টদলের এই আকস্মিক শক্তি বৃদ্ধির কারণ কি? ..... সোসিয়েল ডেমোক্রাট গভর্ণমেণ্ট এর উপযুক্ত ছিলেন না। ..... এই সময় ১৯৩০ সালে হেনরিক ব্রুনিং গভর্ণমেণ্ট ভার গ্রহণ করিলেন এবং তিনি পার্লামেন্টারি শাসনের বদলে ডিক্টেটরি চালাইতে লাগিলেন। ..... ১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী হিটলারের ডাক পড়িল চান্সেলারের পদ গ্রহণের জন্য। এর আগেই বড় বড় ধনপতি ও শিল্পপতিগণ হিটলারের পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়িয়াছিল কমিউনিষ্ট আধিপত্যের আশংকায়। ..... ১৯৩২ সালে দুইবার এবং ১৯৩৩ সালে আরও দুইবার কমিউনিষ্টরা ইউনাইটেড ফ্রন্ট গঠনের যে আবেদন জানাইলেন, সোসিয়েল ডেমোক্রাট দল তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন।" (পৃ: ১৮-২০)

"১৯৩৬ সালে রাইনল্যাণ্ড হইতে ১৯৩৮ সালে চেকোশ্লাভাকিয়া পর্যন্ত হিটলারের মুঠির তলায় আসিয়া গেল।

.....১৯৩৭ সালে জাপান পুনরায় চীন আক্রমণ করিল। ১৯৩৬—৩৯

১. সরোজমোহন মিত্র। পশ্চিমবঙ্গ। প্রবন্ধ: আমি তোমাদেরি লোক। রবীন্দ্র সংখ্যা | বর্ষ ১১ | ৪৪-৫৫ যুগ্মসংখ্যা, ২৫শে বৈশাখ ১৩৮৫ | পৃ: ৯৮৭

সালে স্পেনে ফেনাবেল ফ্রাঙ্কো কর্তৃক গৃহযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল, ১৯৩৮ সালে মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল এবং পরের বৎসর এপ্রিল মাসে মুসোলিনী আলবানিয়া দখল করিলেন। তারপর ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে অকস্মাৎ হিটলার ঐতিহাসিক রুশ জার্মান অনাক্রমন চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। ইহাই ছিল তাঁর সেদিনের ডিপ্লোম্যাসির সবচেয়ে চতুরতা পূর্ণ কাজ।

.....পৃথিবী যেন নিঃশব্দ উৎকণ্ঠায় হিটলারী বিভীষিকার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।" (পৃ: ৩৬)

"১৯৩৯ সালের ৭ই এপ্রিল ক্ষুদ্র ও অসহায় আলবানিয়া রাজ্য মুসোলিনীর দখলে চলিয়া গেল-ফ্যাসিষ্ট পক্ষপাতী ইউরোপীয় শক্তিবর্গ নীরব দর্শক মাত্র রহিলেন। সাম্যবাদী রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষকে কেন্দ্র করিয়া এইভাবে ইউরোপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌঁছিল।' (পৃ: ৪৮)

'চার্চিল চিরকাল সাম্রাজ্যবাদী ও গোঁড়ারক্ষনশীল ছিলেন। .....তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক ইঞ্চি জমি কিংবা ভারতবর্ষের বৃহৎ জমিদারি ছাড়িতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। .....১৯৩২ সালে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন যখন এক সময় (আগষ্ট) বিদ্রোহের আকার ধারণ করিল এবং ভারতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসিবার জন্য চার্চিলের উপর চাপ পড়িল তখন উইনস্টান চার্চিল চটিয়া গেলেন এবং তপ্ত কণ্ঠে ঘোষনা করিলেন—

'I have not become the king's first Minister in order to 'preside over the liquidition ofthe British Empire'—(The Times, Nov. 1942)" (17) : (পৃ: ৩৭৯)[১০]

ব্যক্তি জীবনের সমস্যা সমষ্টির দরবারে উপস্থিত বলেই সমাজ এবং জীবনের সঙ্গে সাহিত্য মিলেমিশে সত্য হয়ে উঠতে সচেষ্ট। জীবন মাত্রই ব্যক্তির অস্তিত্ব এবং সাহিত্য তার সামগ্রিক প্রতিফলন। আর সমাজ সেই বিরাট সত্যকে অধিকৃত রূপে বক্ষে ধারণ করে আছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক সমালোচক সমাজ, জীবন ও সাহিত্য এবং জীবন ও শিল্প বিষয়ক নানা প্রকৃতির চিন্তাভাবনার মধ্যে নিবিষ্ট। বিষয়গুলো এতোই জটিল এবং সংশ্লিষ্ট যে জলমিশ্রিত দুগ্ধের মতোই অবিভাজ্য ব্যাপার। সামগ্রিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, ব্যথা, বেদনার প্রকাশ সমাজ মঞ্চের বাঁধা

১০ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস | প্রথম খণ্ড | প্রথম প্রকাশ ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ |

দৃশ্যপটে। জীবনের কথা ভাবতে গেলে সমাজ ভেসে ওঠে। মানুষতো সমাজবদ্ধ জীব। সুতরাং সমাজকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। বলা যেতে পারে সমাজ এবং জীবন পরস্পর হরিহর আত্মা। সাহিত্য এখানে এদেরও স্বরূপ প্রকাশে উন্মুখ। কবি জন্ম নেন ঐতিহ্যের পীঠস্থানে। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর অনুভবের কারবার।

কবি-মন উপলব্ধির সম্ভার নিয়ে সৃষ্টি করে দান সামগ্রী, যা সারা বিশ্বের সত্য। আকৃতি, প্রকৃতি, ভাষা, সভ্যতা সংস্কৃতি নিয়ে মানুষের গোটা জীবনযাপন ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে পৃথক হলেও শোষণ পীড়নের যন্ত্রে জীবন কিন্তু একই সুরে আর্তনাদ করে ওঠে। সুতরাং সাহিত্যের ত্রিমুখী তরঙ্গ ধারার (॥ ক ॥ অতীতের ঐতিহাসিক তথ্য ॥ খ ॥ মধ্যকালীন চিত্র সম্ভারে গড়া পারিপার্শ্বিক সমাজ ॥ গ ॥ সমকালীন বাস্তবতা) মধ্যে শেষোক্ত বাস্তবমুখী ধারার অমোঘ প্রকাশ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করছে। শোষকের রাজভোগের চেয়ে শোষিতের চিত্ত বিকার এই ধারায় এসে সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে সবচেয়ে বেশী। এর ভিতর থেকেই আমরা Real—movement কথাটির গুঞ্জন শুনতে পাই।

কৃষিজীবীর দারিদ্র্যশিষ্ট জীবনের প্রতি সমবেদনার পরিচয় পাই। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে। জমিদার হয়েও একস্থানে অকপটে তিনি বলতে পারলেন :

"আমাদের দেশে যা দেদার পড়িত রয়েছে সে হচ্ছে মানব জমিন, আর আমরা যদি স্বদেশে সোনা ফলাতে চাই তাহলে আমাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য হবে এই মানব জমিনের আবাদ করা। এবং তার জন্য দেশের জনসাধারণের মনে রস ও দেহে রক্ত এই দুই যোগাবার জন্য আমাদের যা কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, যা কিছু মনুষ্যত্ব আছে তার সাহায্য নিতে হবে।" ১

সোভিয়েত সাহিত্য গণজীবন ভিত্তিক। মাক্সিম গোর্কি বলেন :

"ঘটনা; জনগণ এবং শ্রমের মধ্যে মানুষে মানুষে সম্পর্কের ছবি ফুটিয়ে তোলা রূপ কল্পের মাধ্যমে এবং এইভাবে সমাজতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তার মূল কর্তব্য।" ২

সুতরাং বলা যেতে পারে, মানবতাবোধ বাস্তব মুখী সাহিত্যের অমূল্য

---

১. প্রবন্ধ-সংগ্রহ | প্রমথ চৌধুরী 'রায়তের কথা'।
(রায়তের কথা/১৯২০)

২. সোভিয়েত ইউনিয়ন আজও আগামীকাল | পৃঃ ৩৬২ | তথ্য, সংখ্যা, চিত্র |
মস্কো ১৯৬০

সম্পদ। সেই সূত্রে রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য স্মরণযোগ্য:

"Novels, Dramas and poems were written invoking the memory and achievements of great Indian heros and fighters for freedom, like Sivaji, Ranapratap Singha, the Rajput Chief Durgadas, and even the ancient hero Chandra Gupta Maurya ..... Thus the Swadeshi movement creatd a type of literature which was frankly propagandist." 1

গণজীবন আলোচনার যৌক্তিকতা বিচার ও ব্যাখ্যার এই সূত্রে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে থেকে ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণগুলো যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা যেতে পারে।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, আরবী, তুর্কী, তাতার মুঘল শাসন পর্বেই পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার এবং পরিশেষে ইংরেজের আগমন বাঙলা দেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার প্রকৃতি বদলে দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব থেকে বর্তমান কাল অবধি এই বিরাট পরিসরের মধ্যে সাহিত্যের গতিকে তিনটি বিশেষ পর্বে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

॥ ক ॥ রামমোহন রায় থেকে ইয়ং বেঙ্গল।

॥ খ ॥ বঙ্কিম—মধুসূদন, ভূদেব—বিবেকানন্দ।

॥ গ ॥ আধুনিক।

উপরিলিখিত বিষয় নিয়ে যথাস্থানে আলোকপাত করবো। গণ-সাহিত্যিক এবং লোক—সাহিত্যিকের মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে 'রিয়ালিজম' প্রবন্ধে শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্য স্মরনীয়:

"এখানে সাহিত্যিক এবং সাধারণ শিল্পীর মনে জনগণের পরম কল্যাণের একটি জীবনাদর্শ দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে;
এই জীবনাদর্শে অটল বিশ্বাস লইয়া সাহিত্য এবং সাধারণ শিল্পের মারফতে জনগণকে এই জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবার ব্রত যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাই গণ-সাহিত্যিক বা গণশিল্পী।" ২

---

1. R. C. Majumder | History of the freedom movement | Page 144 to 146 First Published | 1963

২. শশিভূষণ দাশগুপ্ত | রিয়ালিজম | ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র পাল সম্পাদিত সমালোচনা সাহিত্য গ্রন্থ | পৃ: ১৪ | চতুর্থ সংস্করণ | অগ্রহায়ণ ১৩৭৩

এই প্রসঙ্গে নারায়ণ চৌধুরীর বক্তব্যও বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে: 'সাহিত্যের এই ভাবজীবনকে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা যত বেশী আমরা অনুস্যূত ও অনুপ্রাণিত করে তুলতে পারবো ততই বাংলা সাহিত্যে গণতন্ত্রের জয় জয়কার রব উত্থিত হবে।"১

গণসাহিত্য হবে গণমানসের সার্বিক কল্যাণপ্রসূত রূপাদর্শের প্রকাশ। আর লোকসাহিত্য গ্রাম্য-জীবনের সুখদুঃখের নানা পাঁচপাঁচি কথা ও কাহিনী। অশিক্ষিত পটুত্বের স্বাক্ষর যুক্ত মৌখিক কথার বাঁধা। সে সব রচনা আজ মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে আমাদের চিন্তার পাথেয়।

"চাঁদ কোথা পাবো বাছা যাদুমণি !/মাটির চাঁদ নয় গড়ে দেবো
গাছের চাঁদ নয় পেড়ে দেবো/তোর মতন চাঁদ কোথায় পাবো।

অথবা

'ওপারেতে কালো রঙ/বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুকটুক করে/গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।'

গণজীবনের সাহিত্য শুধু ভাষা অলংকারেই বদ্ধ নয়, ভাবকেন্দ্রিক এবং আদর্শ নিষ্ঠও বটে। জীবন ও সমাজের সুখ-জ্বালাকে মননে ও মনীষায় মার্জিতরূপে জনসমীপবর্ত্তী করার ভিতরে তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু লোকসাহিত্যের রচয়িতাদের সহজ সরল কবি-মনের ভাষা নিরাভারণ হওয়া সত্বে ও হৃদয়গ্রাহী। কখনো সূক্ষ্ম-রুচি সম্পন্ন না হলেও তার কোথাও স্নিগ্ধ তরলতা আবার কোথাও বা অর্থবহুল গাঢ়তা। এই বৈসাদৃশ্য লোকসাহিত্য প্রাক্-আধুনিক ধারায় বহমান। এবং গণসাহিত্য বিংশশতাব্দীর সর্বাধুনিক লিখিত দলিল।

দুটি ইতিহাস খ্যাত মহাসমরের সঙ্গে যুক্ত সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের বিষক্রিয়া একদা জাতির জীবনে অন্ন বস্ত্র এবং শিক্ষার অপ্রতুলতাকে ভয়ংকর করে তুলেছিল। শস্য শ্যামলা কৃষিপ্রধান বাঙলায় মন্বন্তর দেখা দিল।

বাঙলা দেশে দশসালা বন্দোবস্ত (১৭৮৯), চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩), রেন্ট অ্যাক্ট (১৮৫৯), জমিদারী আইন (১৮৭৫), বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট (১৮৮৫) রাষ্ট্রবিপ্লব (১৯০৫), সংযুক্ত বাঙলা (১৯১১), ভারত শাসন আইন (১৯১৯), আটক আইন (১৯২৪), টেনান্সি অ্যাক্টের সংশোধন (১৯২৮ এবং ১৯৩৮) গণজীবনের সমস্যাকে ত্বরান্বিত করল।

১. নারায়ণ চৌধুরী | আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ণ | পৃ: ১৩১ | ১ম প্রকাশ। ভাদ্র ১৩৬৫

কলঙ্কিত বৃটিশ শাসনপর্বের অবসানের পর মনুষ্যজাতি এদেশে যেমন লুপ্ত হয়ে যায়নি তেমনি সাহিত্যের গতিপথ সাময়িকভাবে রুদ্ধ হলেও একেবারে নিশ্চিহ্নও হয়নি। পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থাকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষার দায়িত্ব সমাজ বিজ্ঞানীদের মনেই শুধু জাগেনি। সাহিত্য সেবীরাও সে বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন। যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী এবং মানবতাবাদীদের নীতি-মূলে যে সংঘাত সেখানে লোকসানের হিসাব অর্থহীন। আতঙ্ক সৃষ্টির চেয়ে ত্যাগের মধ্যে রয়েছে মানবিকতার প্রকাশ। মানুষের অধঃপতন এবং সর্বনাশের মধ্যে মানুষের মূল শক্তির অপব্যয়। যুদ্ধ, বর্ণ-বৈষম্য, সামাজিক কুসংস্কার নৈতিক দায়িত্বের কাছে মানুষকে ছোট করে সমস্যাকে বিষময় করে তোলে। সহজ প্রীতির বাঁধন যেখানে আলগা, সেখানে হত্যাকাণ্ড পীড়ন, লুণ্ঠন অসন্তোষকে ধূমায়িত করে। ফলে দেশ জুড়ে বিদ্রোহ, অসহযোগ, সেখানে শান্তি বিঘ্নিত। সমপ্রাণিতাবোধে উদ্বুদ্ধ এবং মনুষ্যত্বে জাগ্রত কিছু প্রাণ তাই মুক্তিকামী মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চায়। ভারতের বুকে সেই অস্থিরতা যেদিন তীব্র হয়ে উঠে, সেদিন গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসেন দেশপ্রেমিকরা। গান্ধীজীর কর্মপদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের মনে শ্রদ্ধা জাগিয়েছিল। তিনি মহাত্মার উদ্দেশ্যে লেখেন:

"ভক্তি করতে পারি মহাত্মাকে, যাঁর সত্যের সাধনা আছে। মিথ্যার সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি সত্যের সার্বভৌমিক ধর্মনীতিকে অস্বীকার করেননি। ভারতের যুগসাধনায় এ একটা সৌভাগ্যের বিষয়। এই একটি লোক যিনি সত্যকে সকল অবস্থায় মেনেছেন, তাতে আপাতত সুবিধে হোক বা না হোক; তাঁর দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে মহৎ দৃষ্টান্ত। পৃথিবীতে এবং স্বাতন্ত্র্যলাভের ইতিহাস রক্ত ধারায় পঙ্কিল, অপহরণ ও দস্যুবৃত্তির দ্বারা কলঙ্কিত। কিন্তু পরস্পরকে হনন না করে, হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় না নিয়েও যে স্বাধীনতা লাভ করা যেতে পারে, তিনি তার পথ দেখিয়েছেন।"[১]

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল, কুখ্যাত জেনারেল ডায়ার পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে বিশহাজার জীবনকে, দেড়'শ সৈন্যের যে'ল'শ রাউণ্ড গুলির মুখে নিশ্চিহ্ন করে দেন। তদবধি ফাঁসি, কালাপানি এবং বৃটিশ কারাগারে অনেক প্রাণকে পচিয়ে মারারও ব্যবস্থা হয়েছিল। আসুরিক পাশাচারের এত ভয়ংকর সংকট জাতির জীবনে অনেক নয়। বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে গণ-বিক্ষোভ-পুষ্ট আন্দোলন এবং সংগ্রাম-স্পৃহা, নিষ্পত্তির জন্য অনিবার্য হয়ে

১০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | মহাত্মা গান্ধী (রবীন্দ্র রচনাবলী)। পৃঃ ৪৫০ | একাদশ খণ্ড : প্রবন্ধ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ | ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮

ওঠে। পুঁজিবাদী শাসনে শোষণ-ব্যবস্থা থেকে মুক্তির আশায় গণবিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এই প্রকৃতির সংগ্রামের কথা অনেক মনীষীও ভেবেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য :

"সম্প্রতি ইউরোপে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার একটা চেষ্টা চলেছে। ইতালি এক সময়ে বিদেশীর কবলে ধিক্কৃত জীবন যাপন করেছিল; তারপরে ইতালীয় ত্যাগী যাঁরা যাঁরাবীর, ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডি, বিদেশীর অধীনতা-জাল থেকে মুক্তিদান করে নিজেদের দেশকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও দেখছি এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার জন্যে কত দুঃখ, কত চেষ্টা, কত সংগ্রাম হয়েছে। মানুষকে মনুষ্যোচিত অধিকার দেবার জন্যে পাশ্চাত্য দেশে কত লোক আপনাদের বলি দিয়েছে।" ১

কৃষিকেন্দ্রিক ভারতবর্ষে মানুষের মন উৎপাদনের ক্রমোন্নতির উপর নির্ভরশীল। অখণ্ড বাঙলায় একদা বৈচিত্র্য এনেছিল উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সভ্যতার দুর্দমনীয় প্রভাব। নগর সভ্যতা বিলাস-জীবন সম্পর্কে মানুষকে যতই সচেতন করে তুলুক, তবু নগরমুখী সেই মনোভাব পল্লীকে ভাঙতে পারেনি। তবে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার শিকার হয়েছে পল্লীবাসীই। গণজীবনের বিশিষ্ট মূল্য বিংশশতকের দান। যা কিছু কল্যাণ, যা কিছু ভাবনা গণজীবনকে নিয়ে।

বিশ্বাস না করে পারা যায় না যে সেই আধুনিক সাহিত্যের যাত্রার পথ তৈরী করে যান রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তিনি বিংশশতক শুরু হওয়ার দশ পনের বছর পূর্ব থেকেই সে কাজে হাত দেন।

আমরা জানি. ভারতের বুকে বৃটিশ, তার সামরিক বল এবং কূটনৈতিক বুদ্ধি খেলাবার সর্বপ্রকার কৌশল আরোপ করেছিল। ভারতীয় গণজীবনের প্রাক্-জাগরণ মুহূর্তে রাজন্যবর্গ, মারাঠা, শিখসম্প্রদায়, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর জ্বলে ওঠে। নিশ্চেষ্ট থাকেনি সিপাহী—বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ আর বুদ্ধিজীবী দল। স্বাতন্ত্র্যবোধের ঘায়ে জেগে উঠেছিল বিবেকানন্দ মনুষ্যত্ব। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এই দীর্ঘ একশ' বছরের মধ্যে ইংরেজ বণিকসংঘ গাঁয়ের চাষী-মজুর রুদ্ধ করতে পারেনি। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ শাসক পার্লামেন্টের অন্তর্ভুক্ত হবার পর শাসক-শাসিতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

ফলে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সমাজনীতি, রাজনীতি,

---

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহাত্মা গান্ধী (রবীন্দ্র রচনাবলী)। পৃঃ ৪৪৯।একাদশ খণ্ডঃ প্রবন্ধ জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ। ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮

অর্থনীতি যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল তাতে ভারতবাসীর চিন্তার উদ্রেক হবারই কথা। এর সূত্র ধরেই সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীকালে বিপ্লবী ভারতের পরিচয় নিতে গিয়ে দেখা যায় ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, বাঙলা তথা ভারতবর্ষের সংগ্রামের প্রথম ইতিহাস রচনা করে,তা কৃষক-বিদ্রোহ নামেই খ্যাত। তারপরের যে বিদ্রোহ তা, ওয়াহাবী ও তিতুমিরের বিদ্রোহ (১৮৩০), মুণ্ডা—কোলবিদ্রোহ (১৮৩১—১৮৩২), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫—৫৬) এবং নীলবিদ্রোহ (১৮৬০) নামে খ্যাত।

বহু আলোচিত সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতের মাটিতে ধনী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। বৃটিশ এবং ভারতীয়দের স্বার্থের সংঘর্ষ বাঁধে। ফলে জাতীয় অপমান, কৃষি-ভাবনা, ইলবার্ট বিল এবং কংগ্রেসের জাগরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

বিংশশতাব্দীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রেরণা-প্রসূত রাজনৈতিক অবস্থা বাঙলা দেশে গণবিক্ষোভের মঞ্চ প্রস্তুত করে (১৯০৫ থেকে ১৯১৪)।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' দ্বারা জমিদার সৃষ্টি করেন। এবং পরবর্তীকালে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্বের আশায় ভূমি বন্টনের যে নিয়ম পালিত, তার ফলে মধ্য-স্বত্বভোগী তালুকদার সম্প্রদায় মধ্যশ্রেণীরূপে পরিচিত হয়। জমিদার, মহাজন এবং সর্বশেষ মধ্যশ্রেণী। কিন্তু বিংশশতকের প্রারম্ভে কৃষি ভাবনা এবং বেকার জীবনের শূন্যতা মধ্য শ্রেণীকে আশাহত করে। এই মধ্যশ্রেণীর একাংশ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ভয়াবহ কৃষি বিপর্যয়ে পঙ্গু হয়ে শ্রমিক জীবনে পদার্পন করে। শিক্ষিত বেকার যুবক দল আর্থনীতিক দুর্দশায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় দুর্ভিক্ষ স্থায়িত্ব লাভ করে। চতুর বৃটিশ শাসক কৃষক জীবনকে দুর্বল করে দেবার ইচ্ছায় তৈরী করে জমিদার এবং মহাজন। নিজে সংগ্রহ করে জমির রাজস্ব, জমিদার থলি পূর্ণ করে খাজনায় এবং মহাজনরা অবশিষ্ট ফসল সুদের দায়ে আত্মসাৎ করে।

এই সব স্বার্থ-সিদ্ধির চক্রান্তই জনজীবনে উষ্মা প্রকাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯০৭ থেকে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ এবং পাঞ্জাবে সম্মিলিত কৃষক, শ্রমিক এবং ছাত্রদের সংগ্রাম-মুখী হতে দেখা যায়। অনুরূপ-ভাবে ১৯১৮ থেকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ অবধি খিলাফৎ আন্দোলন ভারতব্যাপী ধূমায়িত। সুতরাং ভারতের নানা স্থানে কৃষক অভ্যুত্থান, গুজরান ওয়ালা অভ্যুত্থান এবং ১৯২০ থেকে ১৯২১ মালাবারে মোপলা কৃষকদের পঞ্চম অভ্যুত্থান। ১৯২১ থেকে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা, বেরিলি

এবং গোরক্ষপুর—এ চৌরি চৌরা—বিদ্রোহের মতো কৃষক বিদ্রোহ, বাঙলা দেশের তটতলেও তার তরঙ্গাঘাত লক্ষ্য করা যায়।

এরপরে বিপ্লবের যাত্রা শুরু হয় আরও উন্নত পর্যায়ে। শ্রমিকের সঙ্গে কৃষক মিশে সংগ্রামকে ভারতের মাটিতে তীব্রতর করে তোলে। ফল স্বরূপ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে গুজরাট রাজ্যের বারদৌলি বিদ্রোহ, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সামন্ততান্ত্রিক পেষণের অবলুপ্তি এবং স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছায় কৃষক—অভ্যুত্থান, আবার অপর পক্ষে পেশোয়ারে শ্রমিক গোষ্ঠীর সঙ্গে কৃষক জাগরণ, শ্রমিক—কৃষক সংঘের প্রতিষ্ঠা, বাংলা দেশে কিশোরগঞ্জ বিদ্রোহ, অযোধ্যা জেলায় কৃষকদের কর নিষিদ্ধ করার সংগ্রাম, এলাহাবাদের কৃষকরা যুক্ত হয় অনুরূপ ব্যবস্থায়। আবার উত্তর প্রদেশের মতো মধ্য প্রদেশের বেরার এবং বুলদানা জেলায় কৃষক—শ্রমিকের প্রেরণায় কৃষক অভ্যুত্থান, সেই-সঙ্গে মহাজন বিরোধী কৃষক জাগরণও দেখা যায়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতীয় চাষী-জাগরণ। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে উত্তরপ্রদেশে অভ্যুত্থান। ১৯৩১—৩৩ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষকরা জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে, সামন্ত তান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এবং ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যেবর্ত্তী সময়কে বৈপ্লবিক সংগ্রামের 'নব অধ্যায়' বলে স্বীকার করে নেয়া যায়।

এই নব অধ্যায়ের পূর্ববর্ত্তী সময়ে (১৯২০) দাদাভাই নৌরজীর "Poverty and unBritish rule in British India" পুস্তকখানি অর্থনৈতিক দুর্গতির প্রত্যক্ষ ইতিহাস। আরও সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে ইংরেজ লেখক মিঃ উইলিয়ম ডিগবির "The Prosperous India" পাঠ করলে। সেখানে লেখা ভারতীয়দের মাথা পিছু দৈনিক উপার্জনের তালিকায় দেখা যায় ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ২ (দুই) পেনী, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১½ (দেড়) পেনী এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ¾ (চারভাগের তিনভাগ) পেনী। এছাড়া রমেশচন্দ্র দত্তের 'Economic History of India' গ্রন্থে এবং 'খোলা' চিঠিতে ভারতীয় চাষীদের দুর্দশার আর এক অধ্যায় লেখা রয়েছে। মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর দু'বছর পর (১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর) লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগ ঘোষণায় মুসলমান সমাজের অধিকাংশ খুশি হলেও হিন্দুরা এই প্রস্তাবকে ঘৃণ্য চক্রান্ত বলে ভেবেছিল। তবু ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বাঙলা দ্বিখণ্ডিত হল। সেই কারণে বুঝি রজনীকান্ত সেন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মধ্যবিত্ত বাঙালীদের ঐকান্তিক চেষ্টায় 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস' প্রতিষ্ঠিত হলে পর স্বদেশী আন্দোলনকে সর্বপ্রান্তে প্রচারের আগ্রহ গেয়েছিলেন :

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।" বঙ্গবিভাগকে অভিশাপ হিসাবে মনে হলেও এটি একটি Greatest blessing. কারণ আঘাত না পেলে জাতির জীবনে চৈতন্যের উদয় ঘটে না। শক্তি অর্জনের মোক্ষম সুযোগ— এভাবেই জাতির জীবনে গড়ে ওঠে।

'বয়কট' আন্দোলনের পিকেটিং দেশীয় মিলমালিকদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করে। এই ভাবে বাংলার জাগরণ সারা ভারতকে উদ্দীপ্ত করে নতুন পথের সন্ধান দেয়।

সম্রাট পঞ্চম জর্জের শুভবুদ্ধি উদয় হওয়ায় ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বাঙলা পুনরায় যুক্ত হয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় ইউরোপে (১৯১৪ থেকে ১৯১৮)। এই ভয়ংকর যুদ্ধের পরিণাম স্বরূপ পৃথিবীর সর্বত্র মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনে দারিদ্র্য ব্যাধির মতো জেঁকে বসে। বাঙলার কিছু অংশে অভুক্ত হতভাগ্যের আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া যায়।

অনিবার্য ভাবে প্রগতিশীল সাহিত্যে, গণজীবন ধীরে ধীরে প্রকাশ হতে থাকে। লেখকদের জনপ্রীতি এই মহৎকর্মে ব্রতী। বিংশ—শতাব্দীতে মার্ক্সীয় দৃষ্টি ভঙ্গীতে প্রগতিশীল লেখক সংঘ গঠনের প্রয়াস লক্ষনীয়। সুধী প্রধানের মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য :

" From the writings of MulkRaj Anand and sajjad zaheer, two founder members of the PWA * readers Know that Marxist cultural movement in India recived its first impetus from Europe. But there is no reason to believe that the movement was sponsored soulely by the communists. " 1

অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক এবং সমাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় বিপিন-চন্দ্র পাল যুবচিত্তকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দিতে এগিয়ে আসেন। তাঁর 'New India' পত্রিকাটি তার জলন্ত স্বাক্ষর। Annals of Rural Bengal' গ্রন্থের ৭০ পৃষ্ঠায় উইলিয়ম হান্টার সন্ন্যাসীবিদ্রোহের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে না পারলেও, এই গৃহত্যাগী সর্বহারার দল আর কেউ নয়, বাঙলার বুভুক্ষু কৃষক সমাজ। এরা ১৭৬৭ থেকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে বিদ্রোহের অগ্নি বর্ষণ

---

* P. W. A. (Progresssve writers' Association)

1. Compiled and Edited by Sudhi Prodhan। Page ii | Chronicles and documents (1936—47) | July 1978

করেছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠে' গ্রন্থখানি তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে আন্দোলন সোচ্চার হয়ে ওঠে তা গণক্ষোভের প্রত্যক্ষ ফল। বাংলা এবং অবশিষ্ট অধিকাংশ রাজ্যে বৃটিশ শাসক স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে ভূমি-রাজস্ব প্রবর্ত্তন করে অর্থনৈতিক শোষণ মারফত কৃষককে কাঁচামালের চাহিদা পূরণে বাধ্য করে এবং যন্ত্রশিল্পের বিলুপ্তির চক্রান্তে তৎপর হয়। দেশীয় শিল্পের ধ্বংসের পথ ধরে বিদেশীয় সম্ভার বাজার ছেয়ে ফেললে ভূস্বামী গোষ্ঠীর নতুন মুখ এসে কৃষক পীড়নের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। ঋণদাতারূপে সেই মহাজন শ্রেনী কৃষক-মনে ভীতির কম্পন তোলে এবং ঋণগ্রস্তের জমি ক্রোক করে নিজেরাই স্বত্বাধিকারী সেজে বসে।

বিভিন্ন জাতি উপজাতি, বর্ণাশ্রম, ধর্মবিশ্বাস ও সার্বভৌমদের যে যোগফল থেকে গড়ে উঠেছে ভারত নামে ভৌগোলিক ঐক্য তাদের পরস্পরের ভিতর বৈরিতা সৃষ্টি বৃটিশ প্রাধান্যের মূল নীতি হয়ে এসেছে। 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল 'শীর্ষক' পত্রে (লণ্ডন, শুক্রবার ২২শে জুলাই/১৮৫৩) কার্ল মার্ক্সের নিম্নবর্নিত মন্তব্যে সে তথ্য জানা যায়:

"মহা মোগলদের একচ্ছত্র ক্ষমতা ভেঙে ফেলেছিল মোগল শাসনকর্ত্তারা। শাসন কর্ত্তাদের ক্ষমতা চূর্ণ করলো মারাঠারা। মারাঠাদের ক্ষমতা ভাঙল আফগানরা: এবং সবাই যখন সবার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত তখন প্রবেশ করলো বৃটন এবং সকলকেই অধীন করতে সক্ষম হল।

..........হিন্দুস্থানের অতীত ইতিহাস না জানলেও অন্ততঃ এই একটি মস্ত ও অবিসংবাদী তথ্য তো রয়েছে যে এমন কি এই মুহূর্ত্তেও ভারত ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়ে আছে ভারতেরই খরচে এক ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর দ্বারা?

..........রক্ত আর কাদা, দুর্দশা ও দীনতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিবর্গ ও জাতিকে টেনে না নিয়ে বুর্জোয়ারা কি কখনো কোন অগ্রগতিকে ঘটিয়েছে?

..........স্বদেশে যা ভদ্ররূপ নেয় এবং উপনিবেশে গেলেই যা নগ্ন হয়ে আত্ম প্রকাশ করে সেই বুর্জোয়া সভ্যতার প্রগাঢ় কপটতা এবং অঙ্গাঙ্গি বর্বরতা আমাদের সামনে অনাবৃত।

..........দস্যু চূড়ামণি স্বয়ং লর্ড ক্লাইভের ভাষায় ভারতবর্ষে যখন সাধারণ দুর্নীতি ওদের লালসার সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না, তখন কি ওরা নৃশংস জবর দস্তির পথ নেয়নি? জাতীয় ঋণের অলঙ্ঘনীয় পবিত্রতার কথা নিয়ে ওরা যখন ইউরোপে বাগাড়ম্বর করছে তখন ভারতে কি তারা রাজাদের ডিভিডেণ্ট বাজেয়াপ্ত

করেনি, কোম্পানির নিজস্ব তহবিলেই যে রাজারা তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ঢেলেছিল ? আমাদের পবিত্র ধর্ম' রক্ষার অছিলায় ওরা যখন ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়ছিল তখন একই সময়ে কি তারা ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ করে দেয়নি এবং উড়িষ্যা ও বাঙলার মন্দিরগুলিতে তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে টাকা তোলার জন্য জগন্নাথের মন্দিরে অনুষ্ঠিত হত্যা ও গণিকা বৃত্তির ব্যবসায় চালায়নি ? 'সম্পত্তি, শৃঙ্খলা পরিবার ও ধর্মের' পুরোধা হল এরাই।" ১

ভারতে বৃটিশ রাজত্বকালে কৃষি—বিপ্লবের আর একটি কারণ সম্পর্কে অভিমত উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ছিল প্রথম যুগের ধনতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি। সুতরাং ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী ধনিক শ্রেণী অর্থাৎ 'ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি' ও পলাশীর যুদ্ধ ও বঙ্গদেশ বিহার উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে শাসন ক্ষমতা অধিকার করিয়া নিজ শ্রেণীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের আদর্শ অনুসারেই অধিকৃত অঞ্চলের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রয়াস পাইয়াছিল। বিদেশী বণিক গোষ্ঠীর এই পুনর্বিন্যাসের ফলেই প্রথমে বঙ্গদেশ—বিহার—উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের এক বৃহৎ অংশের এবং পরে সমগ্র ভারতবর্ষের গ্রাম—সমাজ ভিত্তিক প্রাচীন কৃষি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যায়।

ইংরেজ শাসনের পূর্বে কৃষিভূমির উপর পূর্ণ ব্যক্তিগত অধিকার প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। গ্রামের সমস্ত জমিজমার উপর ব্যক্তিগত অধিকার থাকিলেও তাহা ছিল নামমাত্র। প্রকৃত পক্ষে সমস্ত কৃষিভূমি গ্রাম সমাজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। সাধারণত ভূমি-রাজস্ব ধার্য হইত ব্যক্তির উপর নহে সমগ্র গ্রামের উপর। সেইহেতু প্রকৃত পক্ষে সকল ভূ-সম্পত্তি গ্রাম-সমাজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। ভূমি রাজস্বের দায়িত্ব সমস্ত গ্রামের উপর থাকিত বলিয়াই গ্রামসমাজের অনুমতি ব্যতীত ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও কৃষি-ভূমি বিক্রয় বা দান করিবার অধিকার থাকিত না।" ২

প্রসঙ্গত : গভর্ণর জেনারেল লর্ডবেন্টিঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' সৃষ্ট জমিদার বর্গের কার্যবলী সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য অনুসন্ধান করা যেতে পারে। তিনি একথা সুস্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেছিলেন :

"আমি ইহা বলিতে বাধ্য যে, ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ বা গণ-বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষ কার্যকর হইয়াছে। অন্যান্য বহু

১. কার্লমার্ক্স ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে। পৃঃ ৮৫। মস্কো ১৯৭৩
২. সুপ্রকাশ রায়। ভারতের কৃষক—বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। ১ম খণ্ড। পৃঃ ১৬১

দিকে, এমন কি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পূর্ণ মৌলিক বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যর্থ হইলেও, ইহার ফলে এরূপ একটি বিপুল সংখ্যক ধনীভূ-স্বামী শ্রেণী তৈরী হইয়াছে যাহারা বৃটিশ শাসন অব্যাহত রাখিতে বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত এবং জনগণের উপর যাহাদের অখণ্ড-প্রভুত্ব রহিয়াছে।"১

দেখা যাচ্ছে জমিদারী ব্যবস্থার বিস্তৃতি কৃষিজগতে অরাজকতার কারণ। তদুপরি মহাজনদের শোষণে গ্রাম্যজীবন বিপন্ন।

"ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগে উচ্চ-রাজ কর্মচারী মহলে এবং সরকারী কাগজপত্রে এই প্রকার কর 'খাজনা' নামে অভিহিত হইত। ইহার অর্থ এই যে, কৃষকগণ, প্রকৃতপক্ষে রায়ত হইয়া দাঁড়াইল-তাহারা হইল কোথাও সরকারের রায়ত আবার কোথাও বা সরকার-নিযুক্ত ভূম্যধিকারীর 'রায়ত'। .....মহাজনই হইল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও মহাজনী মূলধনের সমগ্র শোষণ চক্রের একটি অপরিহার্য মূল দণ্ড-স্বরূপ।"২

সামন্ত রাজ্যের কৃষক-বিপ্লবকে সময় অনুসারে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন :

।। ক ।। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের পদুকোটা রাজ্যে।

।। খ ।। ১৯৩১—১৯৩২ খৃষ্টাব্দে জম্মু ও কাশ্মীরে।

।। গ ।। ১৯৩২—১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পুলরাওদীর রাজ্যে শ্রমিক কৃষকের মিলিত বৃহত্তর সংগ্রাম।

।। ঘ ।। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বরোদা রাজ্যের ল্যাভেট অঞ্চলে শ্রমিক-কৃষক বিদ্রোহ এবং পরপর গুজরাটের রাজকোট রাজ্যে; উড়িষ্যা প্রদেশের ঢেনকানল; তালচের ও রামপুর রাজ্যে; মেবার রাজ্যে। এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুর ও মহীশূর রাজ্যেও এই বিদ্রোহের আগুন ছড়ায়।

১৯৪৬ এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের সংগ্রামের দলিলে যুগান্তর আসে। কারণ শ্রমিক কৃষকের সঙ্গে নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী বিমানবাহিনী, ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে সংগ্রামের সামিল হয় তাতে সম্রাজ্যবাদী সুচতুর ইংরেজ শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের হাতে শাসনভার (১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে) ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কারণ ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি

---

১. সুপ্রকাশ রায় | ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস | ১ম খণ্ড | পৃঃ ৫ | ১ম প্রকাশ ১৯৭১ (১৯০৫—১৮)

২. ঐ | ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। ঐ | পৃঃ ১৬১ ঐ | (১৯০১—১৮)

যৌথসংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের অবসান সূচিত করতে সমর্থ হয়। সেগুলো হলো:

॥ ক ॥ ত্রিবাঙ্কুরের 'কয়ার'— এ শ্রমিকের সার্থক সংগ্রাম।

॥ খ ॥ পুন্নাপ্রা—ভায়লারে শ্রমিক—কৃষক মিশ্র বিদ্রোহ।

॥ গ ॥ মহীশূরের স্বর্ণখনি ও বস্ত্রশিল্পে শ্রমিক ধর্মঘট।

॥ ঘ ॥ তেহরি—গাড়োয়াল রাজ্যে কৃষক বিদ্রোহ।

এবং ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদরাজ্যের তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ, কাশ্মীরে শ্রমিক—কৃষক—ছাত্র বিদ্রোহ।

বিশশতকে তপশীল উপজাতি, পার্বত্য উপজাতির বিদ্রোহ নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। তারাও সুখী ও স্বচ্ছল জীবনের আকাঙ্ক্ষী।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে লর্ডকার্জনের মর্মদাহী উক্তির সারাংশ কম বিস্ময়ের উদ্রেক করেনি। বড়লাটরূপে কার্যভার গ্রহণ করেই তিনি ভারতের মুমূর্ষু কংগ্রেসকে নির্মূল করতে এবং কর্মযজ্ঞের প্রথম ও প্রধান কাজ বলে দৃষ্টান্ত রাখতে সংকল্পিত।

তবুও ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট 'স্বদেশী আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দেশ প্রেমিকরা। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ দস্যুর উপর্যুপরি নিষ্পেষণই বিপ্লবী বাঙলার সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কথায় বলতে পারি:

"বাঙলার বিপ্লববাদের ইতিহাস বর্ত্তমান বাঙলার ইতিহাস হইতে বাদ দেওয়া যায় না; কারণ ইহা বিদেশ হইতে আমদানি করা নহে। ইহা বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশের একটি স্তরমাত্র। রামগোপাল ঘোষের সময় হইতে 'ইয়ংবেঙ্গল'-এর (নব্যবঙ্গের) অভ্যুদয় হয়। তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব ও বঙ্গীয় হিন্দু—সমাজের চিন্তার উপর তাহার প্রভাব; রাজনারায়ণ বসুর বৈপ্লবিক মতও নবগোপাল মিত্রের জাতীয় বা হিন্দু—মহামেলা, ন্যাশনাল পেপার এর সংস্থাপনা, ন্যাশনাল থিয়েটার-এ বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির বৈপ্লবিক চেষ্টাও তদনুসারে হুগলীর চারিদিকে লাঠি খেলার আখড়া স্থাপনা; শিবনাথ শাস্ত্রীর দেশ সেবার উদ্যম, সুরেন্দ্রনাথ—বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর বৈপ্লবিক চেষ্টা ও স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন স্থাপনা এবং শেষে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ও কংগ্রেসের কার্য; শিশিরকুমার ঘোষের বৈপ্লবিক জল্পনা—কল্পনা, তৎপরে স্বামী বিবেকানন্দের আনন্দশীল হিন্দুধর্মের মতবাদ এবং শেষ বিপ্লববাদীদের দল স্থাপনা ও কর্ম—এইগুলি বাঙলার জাতীয় জীবনের ক্রমাবিকাশের পরপর স্তর, একটাকে বাদ দিয়া অন্যটাকে

ধরা যায় না."১

স্বামী বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রসঙ্গে মার্কিন-শিষ্যা ভগ্নী গ্রিন্‌স্‌টিড্‌ল্‌ (Miss Grinstidle) এর নিকট পত্রদ্বারা যে অভিমত তিনি প্রকাশ করেছেন তা পাঠে জানা যায় :

".....বিপ্লবোদ্দেশ্যে আমি সমগ্র ভারত ঘুরিয়াছি। আমি কামান প্রস্তুত করিব। আমি স্যার হিরাম ম্যাক্‌সিম্‌-র (Sir Hiram maxim) সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছি। কিন্তু ভারত গলিত হইয়াছে (India is in Putrefication) এইজন্য আমি একদল কর্মী চাই, যাঁহারা ব্রহ্মচারী হইয়া দেশের লোককে শিক্ষাদান করিয়া এই দেশকে পুনঃসঞ্জীবিত করিতে পারিবেন।"২

এছাড়াও বিবেকানন্দের দেশপ্রেম ও জনগণের প্রতি গভীর ভালবাসার অসংখ্য উদাহরণের ভিতর, এস্থলে অন্ততঃ আরও দু'একটি সুচিন্তিত মতাদর্শ তুলে ধরা যেতে পারে :

।। ক।। 'ভারতবর্ষের ব্যাপার এরূপ নয়, সেখানে গরীবেরা উদয়াস্ত খাটিয়া মরে, আর একজন আসিয়া তাহাদের শ্রমের ফল কাড়িয়া লয়। তাহাদের সন্তানেরা উপবাসী থাকে। লক্ষ লক্ষ টন গম ভারতে উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও কচিৎ কখনও একটি কণা কৃষকের মুখে যায়। আপনারা পশু-পক্ষীকেও যে শেষ খাওয়াইতে চান না, ভারতের কৃষক সেই শস্যে প্রাণ ধারণ করে।"৩

।। খ।। "সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য জগতের মূল ভিত্তি।৪

ব্রাহ্ম সমাজ সামাজিক মঙ্গলের আশায় শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম প্রেরণা দিয়েছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে রামমোহন স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় রামমোহনের চিন্তাধারার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত দেন :

"তিনিই প্রথম ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া মানব ইতিহাসের যুগান্তকারী 'ফরাসীবিপ্লব'-এর ভাবধারায় দীক্ষিত হন। কিন্তু তিনি তাঁহার 'বৈপ্লবিক চিন্তাধারা' প্রয়োগের জন্য রাজনীতি অপেক্ষা দেশের সমাজকেই বিশেষ ক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লন।

---

১. ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম। পৃঃ ৬

২. ঐ । ঐ । পৃঃ ৯৯

৩. স্বামীবিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। দশম খণ্ড। ১ম সংস্করণ। পৌষ কৃষ্ণ সপ্তমী /১৩৬৯। পৃঃ ১৭০-১৭১

৪. ঐ । ঐ। ঐ । পৃঃ ২৩৮

তিনি প্রধানত সমাজ সংস্কারক বলিয়া পরিচিত হইলেও রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রচেষ্টার সাক্ষ্য মিলে। পরবর্ত্তীকালে আবিষ্কৃত তাঁহার কয়েকখানি পার্শী ভাষায় লিখিত পত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রামমোহন তাঁহার সময় দিল্লীর নামমাত্র বাদশাহকে কেন্দ্র করিয়া বিদেশী ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদের জন্য একটি সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।"১

শিবনাথ শাস্ত্রীর গভীর দেশপ্রেম মানবতাবাদ কথাটির মহিমাকে গণজীবনে আরো অপরিহার্য করে তোলে। যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' গ্রন্থে উদ্ধৃত শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মপ্রত্যয়ের সেই কথাটি :

"অন্যায়ের উপর ন্যায়ের, অসাম্যের উপর সাম্যের, রাজশক্তির উপর প্রজাশক্তির প্রতিষ্ঠা দ্বারা পৃথিবীব্যাপী এক মহাসাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।"২

পরাধীন ভারতবাসীর মতামতের কোন মূল্য ছিল না বলেই নির্বিঘ্নে ১৯১৪ এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দুটি বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয় সভ্য জীবন যাত্রা-ক্ষেত্রে নিদারুণ বিঘ্ন উপস্থিত হলেও ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, সাহিত্যানুশীলন নাটক এবং যাত্রাভিনয় মাধ্যমে বাঙলার মানসিক নবজাগৃতির সূত্রপাত হয়। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' কবির এই যথার্থ জীবন-সংগীত উদারনৈতিক বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের ধারায় সিক্ত ও সমুজ্জ্বল। মধ্যযুগের দেব মহিমা কীর্ত্তন একালের জটিল সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় ম্লান হয়ে গেছে।

স্মরণ করি, কবি মধুসূদন বীর্যবান মনুষ্য চরিত্রকে শ্রদ্ধা জানিয়াছিলেন অন্তর থেকে। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র তাঁদের রচনায় (বীরবাহু: ১৮৬৪); (বৃত্রসংহার : ১৮৭৫ /পলাশীর যুদ্ধে : ১৮৭৫); (অবকাশ রঞ্জিনী) স্বাদেশিকতার পরিচয় দেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত স্বদেশ প্রেমের খণ্ড কবিতায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নানাবিধ লেখায় বাঙালীর মনোলোকে স্বাদেশিক চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়ে দীর্ঘ নিদ্রা ভেঙে দেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ (১৮৫৫), বহুবিবাহ (১৮৭৩) বিষয়ক জনকল্যানমূলক প্রস্তাব, দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ (১৮৬০) নাটক, কেশবচন্দ্র সেনের 'ভারত সংস্কার সভা (১৮৭০), নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দু মেলা' (১৮৬৭) এবং মনোমোহন বসুর জাতীয় ও ভাবোদ্দীপক সংগীত ধারার (১৮৭৬) ভূমিকা বাঙলা সাহিত্যে দীর্ঘপ্রসারী প্রাণাবেগ সৃষ্টি করেছিল। ফলে অন্তর্জীবনের ক্রমিক রূপায়ণ এবং বিস্তার ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথ ধরেই মধ্যযুগকে পিছনে ফেলে বিস্ময়কর সমুন্নতিতে ক্রমে বিংশ শতাব্দে পদার্পণ

১০ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা | রামমোহন স্মৃতিবার্ষিকী/১৯১৬

২০ যোগেশচন্দ্র বাগল। মুক্তির সন্ধানে ভারত | পৃ: ২৪

করতে পারল।

সমাজ জীবনের বাস্তব ঘটনাবলী সাহিত্য-খাতে গতিময় হয়ে ওঠে সর্বাধিক। সমাজ-রাজনীতি বিষয়ক রচনাদি বুদ্ধিজীবীদের অনুপ্রাণিত করতে সমর্থ হওয়ায় রাজরোষকে প্রজ্জ্বলিত করার গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয়া সহজ হয়েছিল। 'স্বাধীনতা হীনতায়' বিচলিত গণ-জীবন সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মিশে মানবমৈত্রীর উদ্দেশ্যে স্বাদেশিকতা বোধ জাগাতে সচেষ্ট হয়। স্বাধীনতার নবসূর্যালোকে জনগণ আশা, আশাঙ্কায় দোলায়িত। নতুন নতুন সমস্যা সমকালীন জীবনকে প্রকৃত স্বর্গ সুখ দিতে অপারগ হলেও সাধারণ মানুষ নতুনকে বরণ করে নিতে কুণ্ঠিত হয়নি।

প্রথম লোকক্ষয়ী মহাযুদ্ধের কবলে দেড় কোটি মানুষের প্রাণ হানি এবং ত্রিশকোটি বিকলাঙ্গের অভিশপ্ত জীবনের কথা ভোলা শক্ত। এই যুদ্ধের পরিণতিতে দেখতে পাওয়া যায় মার্ক্সের সমাজতন্ত্রবাদ লেনিনের হাত দিয়ে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর—এ রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ শক্তির বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অহিংসমন্ত্র প্রবাসী ভারতীয়দের আন্দোলনমুখী করে পরিশেষে সাফল্যও এনে দেয়। কিন্তু ইংরেজের বৈরীভাব রাউলাট আইন প্রণয়নের ইন্ধন মারফত ভারতীয়দের ভাগ্যে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করে। সে কারণেই জালিয়ানওয়ালাবাগের মতো নৃশংস নিধন-যজ্ঞের ইতিহাস জেনারেল ডায়ারের, বিকৃত রুচির কলঙ্ক বহন করছে। তাঁর নির্মম আদেশে ~~প্রোলশ~~ গুলিবর্ষণ দশ মিনিটের মধ্যে নিরস্ত্র ~~এক হাজারের উপর~~ নর-নারীর ~~(সরকারী হিসাবে তিনশ উনত্রিশ)~~ প্রাণ নষ্ট করে (আহতদের সংখ্যাও নগণ্য নয়)। সেজন্যে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নামেন এবং রবীন্দ্রনাথ সে সময় ~~বহু সম্মানিত~~ 'নাইট' উপাধি ঘৃণাভরে ত্যাগ করেন। অপর দিকে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, যখন ইংরেজরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মুসলমানদের ধর্মগুরু (খলিফ) তুরস্কের সুলতানকে ক্ষমতা চ্যুত এবং অবমাননা করে। ফলে ভারতের মাটিতে মুসলমানদের খিলাফৎ আন্দোলন ফেটে পড়ে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট, হরতাল অনশন এবং সর্তা-সমিতির মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অসহযোগ গণআন্দোলনের রূপ নেয়। কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির সঙ্গে তাঁর (গান্ধীজীর) অহিংস অসহযোগ (Non-violent, non—co-operation) নীতি যুক্ত হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে গান্ধীবাদী জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে একমতে পৌঁছুতে না পারায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে নতুন দল গড়ে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে নামেন।

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে শুধু নয়, এশিয়াতেও ছড়িয়ে

পড়ে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট গণজীবনের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাত ঐতিহাসিক 'আগষ্ট বিপ্লবের' সৃষ্টি করে।

মহাত্মাগান্ধীর 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' (We shall do or die') মন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত জনগণ—'ভারত ছাড়' দাবীতে দেশব্যাপী বিক্ষোভের আগুণ ছড়িয়ে দেয়। নেতাজীর 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে মার্চ তারিখে ভারতের পতাকা মুক্তাঞ্চলে উত্তোলন করে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে নৌ-সেনাদের অসন্তোষ স্বাধীনতাকামী নৌ—বিদ্রোহ গড়ে তোলে। ভারতীয় নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে শাসনভার গ্রহণ কারী ইংলণ্ডের শ্রমিক সংঘ, মন্ত্রী-মিশন পাঠিয়ে ভারতবাসীর মনে আশায় সঞ্চার করতে বদ্ধ পরিকর হয়েছিল। অবশেষে তাই ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

যুদ্ধোত্তরকালীন ভারতের পট ভূমিকায় শ্রমিক অগ্রগতির সূচনাপর্বে রাজ নৈতিক অনিশ্চয়তা জাতীয় ঐক্য, ভৌগোলিক অখণ্ডতা, ধর্মীয় উন্মাদনা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রভৃতি নানা সমস্যা প্রকট রূপে দেখা দেয়। বিশেষ করে বাঙালীর জীবন-দলিল মথিত করে পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বব্যাপী প্লাবন। যুক্তিবাদ, স্বাধীন চিন্তা এবং উদারনৈতিক মনোভাবের আধুনিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রবল হয়ে ওঠে। ফরাসী বিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে বাঙালীর চিত্ত। সামাজিক কুসংস্কার বর্ণবৈষম্যের মতো ধর্মান্ধতা অপসারিত হয় মানসিক শক্তির বিকাশের ফলে। একথা অতি সত্য যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের এ-সব নতুন মানসিকতা। হীনমন্যতার স্থলে আত্মনির্ভরশীলতা। মানসিক প্রস্তুতির উর্বরক্ষেত্র এভাবেই তৈরী হয়। একথা বিশ্বাসযোগ্য নিশ্চয়ই যে, ঊনবিংশ শতকের ইউরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব এসে পড়ে ভারতবাসীর উপর। গ্রীসের স্বাধীনতা আন্দোলন, জার্মানী, ইটালির জাতীয় ঐক্য পরাধীন দেশবাসীর মনে যথেষ্ট প্রেরণা যোগায়। তাই বুঝি নেতাজীর ব্যক্তিত্ব, ঋষি বঙ্কিমের আত্ম মর্যাদাবোধ এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ের বানীর জন্য দেশবাসী শ্লাঘা বোধ করে। কিন্তু একথাও নিশ্চয়ই বিস্মৃত হবার নয় যে, দেশ প্রেম তথা জাতীয়তাবোধ সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে সাহিত্যের অবদান কমনয়।

মানবকুল উত্তরণের পথ খোঁজে সাহিত্য- বিচিত্রতার মধ্যে। সংগীত এবং গীতি কবিতা বাঙালীর মানসিক সংস্কৃতির একটি সার্থক প্রকাশ। ফ্যাসিবাদী গ্রাসনীতি, আমাদের দেশে পঞ্চাশের মন্বন্তর বয়ে এনেছিল। নিঃসন্দেহে সেই কালসীমাকে

'দুর্ভিক্ষের সন্ধ্যা' নামে অভিহিত করা যায়।

এলেন লুইস, ইংরেজ কবি হয়েও বলতে পেরেছিলেন : "ইংরেজ ভারতকে রুটি দেয়নি, দিয়েছে পাথর।"১

আর সমারসেট মমের কথায় জানি :

"ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার সময়ে লোকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কোন দৃশ্য আমাকে সবচেয়ে বেশী অভিভূত করেছে? আমিও প্রত্যাশিতভাবে উত্তর দিলুম। কিন্তু আমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল তাজমহল নয়, বারাণসী ঘাট নয়, মাদুরার মন্দির বা 'ত্রিবাঙ্কুরের পর্ব্বতমালা নয়' আমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল চাষী; ভীষণভাবে জীর্ণ শীর্ণ; তার নগ্নতা ঢাকবার জন্য শুধু এক টুকরা কানি তার নিজের চষা রৌদ্রদগ্ধ মাটির রঙ তার ঘর্মাক্ত শরীরের মধ্যভাগে জড়ানো, ভোরে হিমে কম্পমান, দুপুরের তাপে ঘর্মাক্ত চাষী, শুকনো ক্ষেতের উপরে যখন সূর্য লাল হয়ে অস্ত যায়, তখনও যার ছুটি নেই। উপবাসী চাষী যে অবিশ্রাম খাটে, উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে সারা ভারতের বিরাট ভূখণ্ড ব্যেপে খেটে চলেছে, যেমন তার বাপ খাটত তেমনি বংশের পর বংশ খেটে চলেছে, তিন হাজার বছর ধরে সেই যখন আর্য আগুন্তুকেরা এদেশে হানা দিলে সেই কাল থেকে খেটে চলেছে সামান্য এক মুঠো খাদ্যের জন্য, যার একমাত্র আশা কোনো মতে বেঁচে থাকা। এই দৃশ্যই ভারতবর্ষে আমার কাছে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী লেগেছে।

ওএলিংটন নাকি বলেছিলেন যে ওআটর্লুর যুদ্ধে জেতা হয়েছিল ইটনের খেলার মাঠে। মনে হয় ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকেরা বলবেন যে ভারতবর্ষের সর্বনাশ হয়ে গেল ইংলণ্ডের যত পাব্লিক স্কুলে।"২

তাই মানুষের ক্ষুধার জ্বালা যতদিন না জুড়োবে ততদিন সমাজ ও বাস্তব-সচেতন সাহিত্যিক, শিল্পী নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না। ইতিহাস গতিশীল বলেই সাহিত্য শিল্প পিছিয়ে নেই। তাই রাজতন্ত্রের মোহ ভেঙ্গে ধনিকতন্ত্রের মধ্য দিয়ে পরিশেষে গণতন্ত্রমুখী হয়ে মানবতাবাদের শীর্ষে পৌঁছুতে সাহিত্য উন্মুখ। যে কোন আদর্শের নির্দিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের হিতসাধন করা। সেই প্রয়োজনে সাহিত্য ব্যক্তি ছেড়ে সমাজ জাগরণে উৎসুখ, ঐতিহ্য চেতনায় এবং সামাজিকতায় সমৃদ্ধ এবং প্রগতিশীল হতে সচেষ্ট।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সরকারী শিল্পনীতি, আমদানীর উপর কঠোর ছিল যুদ্ধের কারণে। ইংরেজ বাঙালীর সন্ত্রাসবাদকে বিচূর্ণ করতে প্রয়াসী ছিল। কিন্তু

---

১. বিষ্ণু দে | সাহিত্যের দেশ বিদেশ | পৃঃ ৯৩ | ১ম প্রকাশ ১৩৬৯

২. বিষ্ণু দে | সাহিত্যের দেশ বিদেশ | পৃঃ ৯১, ৯২ | ১ম প্রকাশ ১৩৬৯ |

মরণোন্মুখ জাতিকে বাঁচার রসদ দিয়ে যায়নি। তা প্রত্যাশা করাও অর্থহীন। ফলে ১৯৪৭ *ক এবং ১৯৭১ *খ খ্রীষ্টাব্দের দেশে বিভাগের সংকীর্ণতা গ্রামীন অর্থনীতিকে দুর্বল করে দেয়। শরনার্থীদের ভরণ পোষণ ও বাসস্থান সমস্যার সমাধান করতে না করতে, খাদ্য, বেকার জীবনের সমস্যা জটিলতর হয়ে ওঠে। ভারত কৃষি প্রধান দেশ। অথচ কৃষি ব্যবস্থা অত্যন্ত অনগ্রসর। গ্রামীন শিল্পের শোচনীয় অবস্থা দুর্ভাবনার বিষয়। মনে হয়, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণগুলির মধ্যে প্রধান রাজনৈতিক কারণ। দুই শতাব্দীর পরাধীনতা ভারতকে অনগ্রসর দেশে পরিণত করেছিল।

সামাজিক কারণগুলির মধ্যে বর্ণ বৈষম্য, যৌথ-পরিবার প্রথা শ্রম শক্তিকে দুর্বল করেছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে এবং নানান অর্থনৈতিক সমস্যার পীড়নে পুরনো ভিত ধ্বসে গিয়েছিল। শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে বংশানুক্রমিক কর্মদক্ষতা হ্রাস পাওয়ায় কর্মকুশল শ্রমিক তৈরী হতে পারেনি। বলতে বাধা নেই, দক্ষতা বাড়তে পারে যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে। কিন্তু সে শিক্ষার প্রসার আমাদের দেশে অপ্রতুল। সেই কারণে নিরক্ষর কৃষক, শ্রমিক রাষ্ট্রের বোঝা মাত্র। স্বাস্থ্য হীনতা কিংবা জীবন যাত্রার নিম্নমান, এই অর্থনৈতিক দুর্বলতার আর একটি বড় কারণ। দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার সমস্যা যেদিন দূর হবে, মনে হয় সেই দিন কৃষক শ্রমিকের অবস্থার উন্নতিতে দেশ ও সর্ববিষয়েই সমৃদ্ধ হবে।

সাম্রাজ্যবাদের বিনাশ লগ্নেই সমাজতন্ত্রের পথ পরিক্রমার শুরু। গণ-তান্ত্রিক সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়। এর ভিতরই সর্বজনীন সুখ। স্বাধীন দেশের সচেতন শ্রমজীবীদের উচ্চসংগঠিত সমাজ ব্যবস্থাই সবার কাম্যবস্তু নিশ্চয়ই। এখানে প্রত্যেকে সাধ্যানুযায়ী শ্রমদান করবে এবং পাবে তার প্রয়োজন অনুপাতে। এইটি সাধনযোগ্য আদর্শের পথ। আলবেনিয়া, চীন, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, চেকো-শ্লোভাকিয়া, জার্মানী, ভিয়েৎনাম, পোলাণ্ড, রুমানিয়া, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, যুগো-শ্লাভাকিয়া তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উক্ত দেশগুলির মধ্যে মার্কিন—গ্রাম মুক্ত নবতম 'ভিয়েৎনাম' থেকে ফিরে এসে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর "সাইগন থেকে হো চিমিন" নিবন্ধে জলন্ত অভিজ্ঞতা

ক. 'ভারতবর্ষ'কে বৃটিশ দুইভাগে বিভক্ত করে। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান নামে দুইরাষ্ট্র সৃষ্টি হয়।

খ. 'পাকিস্তান' বাঙালী ও আবাঙলী মুসলমানদের সংকীর্ণ স্বার্থের সংঘাতে পৃথক দুটি রাষ্টে বাঙালাদেশ ও পাকিস্তান নামে চিহ্নিত।

বর্ণনায় বলেছেন :

"এবার আমার অবাক হবার পালা। তার মানে, শস্তায় ভাত মাছ আর মাথা গোঁজার ঠাঁই। সেই সঙ্গে বিনা পয়সায় চিকিৎসা আর লেখাপড়া। এরই নাম যদি সমাজতন্ত্রের পথে এগোনো হয়, তাহলে কেন সে দেশের লোক সাইগনের নাম বদ্‌লে আদর করে হো চি মিন রাখবে না?"১

কবি সুকান্তের জনযুদ্ধের নিম্নোদ্ধৃত সংগীতাংশ প্রসঙ্গত :

স্মরণযোগ্য : জনগণ হও আজ উদ্বুদ্ধ/শুরু কর প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ
জাপানী ফ্যাসিষ্টদের ঘোর দুর্দিন/মিলেছে ভারত, আর বীর মহাচীন
....
জনগণ শক্তির ক্ষয় নাই/ভয় নেই, আমাদের ভয় নেই।"

প্রধানত মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট শিল্পিত করে চেখভ, মোপাসাঁর আধুনিক গণ-চাহিদাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারেনি। অতি আধুনিক কাল, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে সামনে রেখে স্বাদেশিকতার এক নতুন মন্ত্র শোনাতে পেরেছে। মালো-জাল, জেলা-কৈবর্ত্ত, কুলি-মজুর, ক্ষেত চাষী কিংবা হরিজন কেউ বাদ যায়নি সাহিত্যে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালিতে নবজাগৃতির সন্ধান দেয় ইতিহাস এবং প্রায় এক'শ বছর পরে ইংলণ্ডে আর সম্ভবত তিন'শ বছর অতিক্রমণের পর ভারতবর্ষে তথা বাঙলার বুকে। এই নবজাগরণ মানুষকে ভাবতে এবং জীবনের মূল্য স্বীকার করতে শিক্ষা দেয়। মধ্যযুগের দেবস্তুতি পেরিয়ে আজকাল গণজীবনের প্রতি দেশবাসীকে শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে তৎপর।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত মার্ক্সবাদে প্রতিষ্ঠিত রিয়ালিজ্‌ম্ কি সে সম্পর্কে বলেছেন :

"সাহিত্য বা সাধারণ শিল্প সৃষ্টি হইবে জীবন লইয়া। কোন ব্যক্তি জীবন নহে, সমাজ-জীবন লইয়া, কারণ ব্যক্তি জীবনের সমাজ-নিরপেক্ষ কোন স্ব-তন্ত্র বা স্বধর্ম নাই; উভয়েই জড়িত একান্ত অঙ্গাঙ্গি রূপে।"২

কথাটা সূক্ষ্মার্থে সত্য যে সমাজীবনের অন্তর্দাহের প্রতিফলন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

১০ সুভাষ মুখোপাধ্যায় | ভিয়েতনাম থেকে ফিরে 'সাইগন থেকে হো চি মিন | পৃঃ ৫ C/o. উত্তরবঙ্গ সংবাদ প্রধান সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন বসু | রবিবার ১৩ই মার্চ ১৯৮৩

২০ শশিভূষণ দাশগুপ্ত | রিয়ালিজ্‌ম্ প্রবন্ধ | সম্পাদক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র পাল সমালোচনা সাহিত্য। চতুর্থ সংস্করণ | অগ্রহায়ণ ১৩৭৩ | পৃঃ ৯৬

সাহিত্য সৈকতে স্থান পেয়েছিল প্রথম। তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়ে এ ধারার প্রধান্তই সব থেকে বেশী স্থান অধিকার করে আছে।

সাম্যবাদী কবিতা প্রসঙ্গে G. S. Fraser তাঁর 'The Modern Writer And This world' গ্রন্থে স্পষ্টই বলেছেন :

"Communist poetry requires a use of the symbolism of the great suffering masses : rather it does not require symbolism or allegory at all but a direct appeal to the masses, a direct praise of them, and a tone of Practical exhortation a direct description of their activities and sufferings. And it must not be cryptical or allusive or obscure, it must make no cultural demands on the masses that would give them a sense of inferiority or weaken them in the struggle." 1

উদ্ধৃতাংশটির কেন্দ্রিকসুর আমেরিকার জনতার কবি ওয়াল্ট হুইম্যানের 'Leaves of Grass' কাব্যের 'Birds af Passage' কবিতায় অনুসন্ধান করা যেতে পারে :

"We primeval forest felling
we the rivers stemming, vexing we and piercing deep the mines
with in
we the surface broad surveying, we the virginsoil up-heaving
pioneers ! O pioneers ! "

এখানে কবি সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শের আকুলতায় অধীর।

প্লেটোর মতে 'Mirror of truth'— ই কাব্য। বাস্তব সত্যের প্রকাশই প্রকৃষ্ট কাব্যের গুণ। একথা সত্য, অতীতকে মেনে নিতে আধুনিক প্রস্তুত নয়। সে কারণেই অন্তর্বিরোধের ফল জীবনপন্থী নাটক বহন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্ক্সবাদে অনুপ্রাণিত হয়েছেন সাঁ-সাঁ, আরাগঁ, মার্ল প্রভৃতি ফরাসী সাহিত্যিকরা।

রুশ সাহিত্য সহায়-সম্বলহীন জীবনকে মর্যাদা দিতে একটু বেশী তৎপর। নিকোলাই ভাসিলেভিচ গোগলের (১৮০৯—১৮৫২) 'ওভারকোট' এবং আন্তন চেখভের 'কেরানীর মৃত্যু' জীবধর্মী গল্প হিসেবে তারই প্রমাণ। আবার একটি কবিতার

1. G. S. Fraser | The Modern writer and his world | Page 238 | 1st Edition 1953 William Clowes and sons LTD. London and Beccles,

দিকে চোখ রাখলে দেখতে পাওয়া যায় একই আন্তরিকতার আভাস :

"মৃত্যুও আসবে জানি— কাটবে না কিছুতে এই শীত
নতুন বাসের পরে ফেলব না পা।
এ কুঁড়ে পড়বে ভেঙে, কেতে কেউ দেবে না লাঙল
শহরে যাবেন চলে মেরি রোমানোভা-কে দেখবে আমার
সাহায্য চাইতে যায়-দেহে জোর নেই।
কাসি নোভিনা গেছে চলে,— গেছে চলে কাসিনোভনা
আমার মৃত্যুর জানি আর দেরি নেই *

উপরিবর্ণিত অংশটি জুড়ে একজন বয়সের ভারে ন্যুব্জ চাষীর জীবনের সামর্থ্যহীন অবস্থার ব্যাখ্যান ইতিবৃত্ত। এ বর্ণনা গণমানুষের জীবন-যন্ত্রণার ছবি। কবি নিকোলাই আলেক্শেভিচ নেক্রাসভ-র মতো এই গণচেতনার পরিচয় অধিকাংশ রুশ লেখকের লেখায় পরিব্যাপ্ত :

"আমারে বাসিবে ভালো; দীর্ঘদিন স্মরিবে জনতা
আমার উদ্গীত বাণী-সংগীতের এ মুকুট চূড়া
নির্মম যুগের বুকে গাহিয়াছি মুক্তির বারতা
দুর্গতের লাগি আমি মাগিয়াছি সপ্রেম করুণা।"**

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের লেখা পুশকিনের এই কবিতাটি মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শেখায়। বঞ্চিতের বুকের জ্বালা যে কত তীব্র এবং গভীর তা উপলব্ধি করতে পারেন মাত্র সার্থক কবিরাই যাঁদের অন্তরে এতো ভালবাসা তাঁরাই তো ব্যথার বেদনায় এমন কাতর। ভলাদিমির মায়াকোভ্স্কি শ্রমিক কিষাণের মরমী কবি। বহু আলোচিত এই বিস্ময়কর প্রতিভা তাঁর বিদ্রোহী ও বীরত্বপূর্ণ রচনাবলীর মধ্য দিয়ে এক জীবনবাদী কবি-হৃদয়ের পরিচয় রেখে গেছেন :

"Whoever cares/that 'Ah, ! poor creature,
how he loved, how his heart did bleed !/···· ···· ···· ····
Hark ;/Locomotives groan
draughts/through their floors and windows blow
"Give more coal from Don,/mechanics
fitters/for the depot !"

---

* গোপাল হালদার। রুশ সাহিত্যের রূপরেখা। পৃঃ ১২৩। ১ম প্রকাশ। অক্টোবর ১৯৬৬

** ঐ । ঐ । ৭৩ । ঐ । ঐ

..../Comrades

Wake up/give us new art

to haul the Republic out of the mud ?"1

মায়াকোভস্কি রুশ সাহিত্যে একজন কবি হিসেবে বিশ্বজনে বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন। Eduardas Miezelaitis তাঁকে বলেছেন 'Great Singer of Revolution* আবার Sergei Narovchator সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন:

"A great poet, of the Soviet people of the Leninist party, and of Communism, Vladimir Mayakovsky towers like a giant over the 20th Century.'2

উইলিয়ম ল্যাংল্যাণ্ড (১৩৩২ ? ১৪০০ খৃষ্টাব্দ) ইংরেজী কাব্যসাহিত্যে অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'The vision of piers the plowman' (১৩৬২ খৃঃ) কবিতায় জনজীবনের অসহায় অবস্থা মূর্ত হয়ে উঠেছে। যদিও চসারের কাল অবধি দেবতা এবং বীরদের কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল তবু তাঁর সাহিত্যে মানবপ্রেমের যে পরিচয় পাওয়া গেছে তার গুরুত্ব অসামান্য:

"A-rys and go reuerence godes resurreccioun.

And creep on knews to the croys and cusse hit for a Iuwel.

And ryght fullokest relyk non riecher on earthe.

For godes blesside body hit bar for ourcbote,

And hit a-fereth the feonde for such is the myghte,

May no grysliche gost glyde ther hit shadeweth !'3'

প্রাচীন ইংরেজী কবিতার মধ্যেও যে অন্তর্চেতনায় সমতা ও কর্ম কুশলতার বিশেষ বিশিষ্ট মূল্য ছিল, ল্যাংল্যাণ্ডের কাব্যাংশেই সেই সত্য প্রতিফলিত। বহু আলোচিত এবং জনপ্রিয় কবি জিওফ্রে চসার-ই (১৩৪৪—১৪০০ খৃঃ) ইংরেজী কাব্য জগতের জনক। জীবনকে নিকট থেকেই দেখেছেন এবং সেই দেখার ভিতর যে কৌতূহল নিহিত ছিল, তা মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধের পরিচায়ক। 'Canterbury Tales'

---

1. Alex Miller | Vladimir Mayakovsky Innovator | Page 90 | 1976

* Do | Do | Page 272 | Do

2. Do | Do | Page 277 | Do

3. দিলীপ কুমার মিত্র। ইংরাজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত | পৃঃ ২৭ | মুদ্রন ১৩৬৯ | যভার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ। কলি—১২

—তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। নিম্নোক্ত কয়েকটি পংক্তিতে তাঁর কৃতিত্বের মূল্যায়ণ সম্ভব নয়। তবুও প্রসঙ্গতঃ এস্থলে উল্লেখযোগ্য :

Thereto she coude so wel pleye,
When that hir liste that I dar seye
That she was lyk to torche bright,
That every man take of light
Yhough and hit hath never the lesse." 1

মধ্যযুগীয় ইংরেজী কবিতা আর আধুনিক ইংরেজী ভাষার কবিতার মধ্যে কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। চসার ও ইংল্যাণ্ডের কবিতায় ফরাসী এবং লাটিন প্রবেশ করায় ভাষা দুর্বোধ্য। মাত্র নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত হল। এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্য সৃষ্টির কালে (১৫৫৭—১৫৯০ খৃঃ) মানবজীবন একটা বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী।

রবার্ট বার্নস (১৭৫৯-৯৬ খৃঃ); জর্জ ক্র্যাবে (১৭৫৪—১৮৩২ খৃঃ) এডমণ্ড বার্ক (১৭২৯—১৭৯৭ খৃঃ); শেলী (১৭৯২—১৮২২ খৃঃ); ওয়ালটার স্কট (১৭৭১—১৮৩২ খৃঃ) এবং ভিক্টোরীয় যুগে এসে চার্লস ডিকেন্স (১৮১২—১৮৭০ খৃঃ)—কে দেখতে পাওয়া যায়।

বিংশ শতাব্দীর জন গল্‌স ওয়ার্দি (১৮৬৭—১৯৩৩ খৃঃ); টি, ই, হিউম (১৮৮৩—১৯১৭ খৃঃ); উইলফ্রেড আওয়েন (১৮৯৩—১৯১৮ খৃঃ); অডেন ১৯০৭—?); সীন ও' কেসী (১৮৮৪-?); ক্যাথারিন ম্যান্সফিল্ড (১৮৮৮-১৯২৩ খৃঃ) প্রভৃতিকে মানবদরদী লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে ধরে নিতে পারি।

ষ্টীফেন স্পেণ্ডার (১৯০৯-?) মনুষ্যত্বের অবমাননায় ক্ষুব্ধ এবং বিচলিত ছিলেন বলেই তাঁর কণ্ঠে শুনি :

"'No man / Shall hunger. Men shall spend equally,
our goal which Compel. Man shall be man." 2

কিংবা গণ-জীবন-প্রেমী কবি শেলীর অপূর্ব কবিতা "Song—To the Men of England'— এ কান রাখলে শোনা যায় সমগ্র মানবতার জন্য তাঁর কী ভাবনা :

"Where fore feed and clothe and save,
From the cradle to the grave,

---

১. দিলীপকুমার মিত্র। ইংরাজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। পৃঃ ৩৩। মুদ্রন ১৩৬৯। মডার্ণবুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ। কলি—২২

২. ঐ ঐ |২৭১| ঐ | ঐ

Those ungrateful drones who would
Drain your sweet-nay, drink your blood ?'

নির্মম বাস্তব এখানে উদ্ঘাটিত। অনাদরে শুকিয়ে যাওয়া জীবনগুলো স্রষ্টার কলমে চিরকালের সাহিত্যে মূর্ত।

মিশরের সাহিত্যেও এই সমাজকেই ভেসে উঠতে দেখা যায়; নিচের কবিতাংশ* দুটির ভিতর,

॥ ক ॥

যে লোক সারাদিন মাঠে চাষ করে/তার চেয়েও একদিন ছুতোর মিস্ত্রীকে
বেশী ক্লান্ত হতে হয়;/কেন না তার ফসলের মাঠ হচ্ছে কাঠ
যার উপর তার র‍্যাঁদা লাঙল দেয়।/সে কোন বিশ্রাম নিতে পারে না
যেহেতু তাকে আলো জেলেও কাজ করতে হয়/ততক্ষণ তাকে কাজ করতে হয়/
যতক্ষণ না তার দুটি হাত ক্লান্তিতে ঝুলে পড়ে।

॥ খ ॥

কামার কোন রাজদূত নয়/তার কাজকে লোকে কৃপার চোখেই দেখে
আমি এ পর্যন্ত কোন স্যাকরাকে দেখিনি/যার খবর এখানে দিতে পারি।
হায়, আমি দেখেছি কামারকে কাজ করতে
তার সামনে আগুন ফুলকি দিয়ে উড়ছে হাপরের হাওয়ায়
তার নখগুলি হয়ে গেছে কুমীরের নখের মতো
তার গা দিয়ে বেরুচ্ছে মাছের আঁশের গন্ধ।"

বিদেশী সাহিত্যের মতো ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যের পাতায় দৃষ্টিপাত করলে ভেসে উঠবে ওই একই ভাবনার প্রতিচ্ছবি। আমরা এখানে তার কয়েকটি রচনা দৃষ্টান্ত-উদ্ধৃত ক'রে অধ্যায় শেষ করব।

উর্দু কবি গালিব: 'মরদ্ হো তু মেহনতী কে কাম আও
(১৭৯৭—১৮৬৯) অর্‌না খাও পিউ চলে যাও।
যব্ কুয়ী জিন্দেগী কা লুৎফ উঠাও
দিল্ কো দুখ ভাই য়োঁকী ইয়াদ দেলাও।
কেৎনে ভাই তোম্ হারে হ্যায় নাদার
জিন্দেগী সে হে জিনকে দিল্ বেজার।*

---

*ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য। পৃঃ ১৮১—১৮২।
মিশরের কোন কোন কবিতায় তৎকালীন সামাজিক জীবন বিশেষ করে খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন-যন্ত্রণা আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠছে।

* শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য। পৃঃ ২৪

(ভাবানুবাদঃ প্রকৃত মানুষ হতে চাইলে, মানুষের কাজ যা তাই করা
দরকার। তানালে জীবজন্তুর মতো আত্মসিদ্ধিতেই মাত্র
মগ্ন থাকতে হবে। আপনার পরম সুখের সময় দুঃখী
ভাইবোনদের কথা স্মরণ করা দরকার। কারণ এই অসহায়
ভাইবোনেরা দারিদ্র্যের পীড়নে দুর্বল চিত্তে সর্বদাই বিপদের
আশংকায় শঙ্কিত।) বিতৃষ্ণায় এদের জীবন ভরে আছে।)

কবি ইকবাল (১৮৭৫—১৯৩৮ খৃঃ) ছিলেন এই কবির যোগ্য উত্তরসূরী। রুশ বিপ্লবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছিল বলেই ইকবাল লিখতে পেরেছিলেন 'খিজর-ই-রাহ'। আরব মুসলমানদের শাসনাধীন সিসিলী সম্পর্কে লেখা নিম্নোক্ত (অনূদিত) কবিতাটি কম মর্মস্পর্শী নয়:

কবি ইকবাল ঃ

"হে আমার রক্ত-ঝরা চোখ, কাঁদো, যত পারো কাঁদো
দূরে দেখা যায় মুসলিম সংস্কৃতির ঐ গোরস্তান।
এক সময়ে এখানেই মরুবাসীরা তাদের তাঁবু গেড়েছিল
তাদেরই জাহাজ করতো মহাসাগরে খেলা ধুলা
বড়ো বড়ো রাজা-বাদশাহদের দরবার তারাই কাঁপিয়ে দিয়েছিল।
তাদের বাঁকা তলোয়ারের ধারে জীবনের আগুনের তেজ ছিল
লুকানো—
তা জ্বলে উঠলেই অরাজীর্ণ আদর্শের মৃত্যু পরোয়ানা ঘোষিত হোত।
তাদের ভয়ে মিথ্যার দুর্গগুলো কেঁপে কেঁপে উঠতো
ওদের যাদুস্পর্শে দুনিয়াতে জীবন জেগে উঠেছে
আজ ওরাই দুনিয়াকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেছিল।
হে আমার চোখ, তোমার যন্ত্রণার কথা আমাকে বলো
তোমার মত আমার ব্যথাও কম নয়।"*

বিপ্লবী কবি ভারতী দাসন তামিল ভাষায় সমবেদনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন বলেই, শুনতে পাওয়া যায় তাঁর সাম্যাশ্রয়ী (অনূদিত) কবিতায়:

"ধর্মনায়ের যাত্রীদল/তোরা হলি বলির পশু
মূর্খতারই শিকার তোরা।"**

---

* নিখিল সেন | এশিয়ার সাহিত্য | পৃঃ ৫৭৭ | প্রথম খণ্ড, ১ম প্রকাশ জুন ১৯৭০।
অনুবাদ: মহম্মদ আবদুল হাই।

** শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য | পৃঃ ৯১ |

মারাঠী কবি কেশব সুত (১৮৬৬—১৯০৫ খৃঃ) কম মূল্যায়না দেখাননি তাঁর সৃষ্ট কবিতাধারার ভিতর। উপোসী হতভাগ্যের মুখ দিয়ে কবি শুনিয়েছেন :

"কাঁহীস সুগ্রাম সদন্ন তু দিলে
সাধী অম্ হা ভাকরহী না কা মিলে ? *

(ভাবানুবাদ : চাষীর বেদনা এখানেই যে, কাজ করে জীবন বাঁচাতে চায়। অথচ মানবপ্রেমী কেউ নেই যে তাকে কাজ দেবে।)

গুজরাতী কবির চড়াসুরের কবিতা সবার ঘুম কেড়ে নিয়ে চেতনায় দুঃসাহসিক :

"রচো রচো অম্বর চুম্বী মন্দিরো ! / ভুখ্যা জন নো জঠরাগ্নি জাগশে
খণ্ডেরনী বসমকনী নলাধশে। **

(ভাবানুবাদ : আকাশস্পর্শী মন্দির গড়ো গড়ো। গড়ে কোন লাভ নেই)। বুভুক্ষু জনতাকে বঞ্চিত করলে ঐ অপকর্মের ইমারত ধুলোয় পরিণত হবেই।)

মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে অধিকতর অগ্রগমনশীল সমাজের মনস্তত্ত্ব ও অখণ্ড জীবনের প্রতিচ্ছায়া যাঁরা সাহিত্যে ফেলতে পেরেছেন তাঁরাই গণ-জীবনের শিল্পী। সেই সত্যের মূল্যায়ণে স্মরণ করা যেতে পারে মার্ক্সের মতাদর্শের কথা :

"In proportion as Labour develops socially and becomes thereby a source of wealth and culture poverty and neglect and culture among the non- workers." 1

মার্ক্স তাঁর প্রথম জীবনের কবিতায় সুস্থজীবন যাপনের প্রতি যে আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন তার পূর্বাভাষ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত অংশে :

—'Perhaps you think ; poet that I can not grasp,
The battles in your soul the light with in your bosom,
The images that strive up wards ?" 2

অথবা

"My heaven and my art become a world
beyond as remote as my love." 3

---

* শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য। খৃঃ ২০৭।
** ঐ | ঐ | পৃঃ ১৬২।

1. S.S. Prauer | Karl Max And world literature | page 357/1976
2. Do | Do | page 10 | 1976
3. Do | Do | page 18 | 1976

এ অধ্যায়ে আমাদের শেষ কথা হল, আর কাব্যরচনার ক্ষেত্রে যে সব কবি গণজীবনের শরিক বলে চিহ্নিত, তাঁদের লেখাও কিন্তু গণমানুষের নিজস্ব বোধের সম্পৃক্ত হয়ে ওঠেনি। কমিউনিকেশনের সমস্যা রয়েই গেছে। নজরুল-সুকান্ত-সুভাষের কবিতা আর গণজীবনের ভিতর কতটা সত্যিকারের সাড়া জাগায়?

আর জাগাচ্ছে না বটে, কিন্তু অসমতালোভীর বর্তমান অত্যাচারের ভিতর দিয়ে আজকের চিহ্নিত ঐ সব গণকবি মধ্যবিত্ত ক্ষয়ে ক্ষয়ে যখন পুরোপুরি গণমানুষের দলে একাকার হয়ে যাবে, সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরে যখন মধ্যবিত্ত নামক মানুষের স্বতন্ত্রতা একেবারেই লোপ পাবে, তখনই শুধু শোষকের মুখোমুখি শোষিতের দাঁড়াবার দিন। আগামী দিনের সেই শোষিতের কণ্ঠ যা গাইবে, কর্ম যা রূপায়িত করবে, সার্বিক বিপ্লবের ভিতর দিয়ে তাই হবে প্রকৃত গণজীবনের বার্তা। মজুর-কৃষকের জীবনের শরিক-কবিকে আমরা কেবল সেইদিনই পাবো। তবু আগামী গায়কের ভূমিকার যে গুরুত্ব তার মূল্যেই নজরুল-সুকান্ত-সুভাষ ইত্যাদি মধ্যবিত্ত কবি আজকের সমাজপটে অবশ্যই স্মরণীয় হোন।